পৌষ-লক্ষ্মী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা-বারো·

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ; ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

মহাত্মা গান্ধীকে

২রা অক্টোবর, ১৯৪৩

পৌষ-লক্ষ্মী

১৩৫০ সালের পৌষ মাস। পঞ্চাশ হ'ল শয়ের অৰ্দ্ধেক। শ'য়ে শূন্য; শ'য়ের অর্দ্ধেক পঞ্চাশেও গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকি অর্দ্ধেক যারা আছে, তারাও আধমরা, হিসাব ঠিক আছে। গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পালপাড়ার কালী-ঘরের সামনে অশথতলায় ব'সে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে। এক ছিলিম তামাকেই গোটা মজলিসের এখন পরিতৃপ্তি হয়, কল্কে আজকাল আর দুটো লাগে না; যে তামাক এক-একজনে পুরো এক ছিলিম খেয়েও তৃপ্তি পেত না; সেই তামাক দু টান টেনেই লোকে এখন কাসতে শুরু করে বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় ক'রে উঠে। এবারের বানের ঠাণ্ডা ক্রমে শ্লেষ্মা হয়ে মানুষের ম্যালেরিয়াজীর্ণ বুকে জ'মে বসেছে গাঁয়ের খিড়কি-ডোবার পচা জলে থকথকে দলাশের মত।

সবচেয়ে বয়স বেশি মুকুন্দ পালের—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। ভারিক্কি লোক। কালো কষকষে রঙ পালের, এককালে জোয়ানও ছিল খুব ভারী, তখন নাকি মাথায় ছিল বাবরিচুলের বাহার। এখন পাল বুড়ো হয়েছে, তারপর এবারকার ম্যালেরিয়ায় ভুগে বার কয়েকই ধোপার পাটায় আছাড়-খাওয়া পুরানো কাপড়ের মত এতবড় দেহখানা তার জ্যালজ্যাল করছে। মাথার চুলগুলি একেবারে কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, এখন পেকে সাদা ধপধপ করছে; পাল প্রায়ই এখন মাথায় হাত বুলায়, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুলগুলির কড়া ডগার উজানের টানে হাতের তালুতে বেশ সুড়সুড়ি লাগে।

পাল হুঁকাটা ঘোষের হাতে দিয়ে বলে, একবার যদি কেউ পুরো এক ছিলিম তামাক খেতে পারে ঘোষ—। ব'লেই সে কাসতে

আরম্ভ করে, কেসে, কাসির ধমক সামলে কথাটা শেষ করে, তবে আর বুকে মালিশ লাগে না। বেবাক শ্লেষ্মা, বুঝেছ? আবার এক ধমক কাসি আসে, এবার মোটা এক চাকা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, পাল আরাম পায়। ঘোষ তখন কাসতে শুরু করেছে। তারপর আরম্ভ হয় শ'য়ের অৰ্দ্ধেক পঞ্চাশের আলোচনা। হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে। চিত্রগুপ্তের কলম। ভূল কি হয়?

ঘোষ কয়েকবার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয়। মুনি-ঋষিদেরই মতি-বেভ্রম হয়, তা চিত্রগুপ্ত। হাজার হ'লেও চিত্রগুপ্ত তো বামুন নয়, কায়স্থ—এবারেই ভুল হয়েছে।

সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কি ভুল হ'ল? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

নদীর ধার পর্য্যন্ত খোলা পূর্ব্বদিকের পানে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে ঘোষ বলে, ধান।

পূর্ব্বদিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত গাঁয়ের মাঠ, তিন ভাগে ভাগ করা—ষাঁড়া জোল, মাঝের জোল, বেনো কূল। নামেই তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরণ রঙ্ ধ'রে এসেছে। ওই ধানই জীয়নকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে, নইলে মরণ—অবধারিত মরণ, তাতে আর কারও কোন সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগদী-কাহার-মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে ছুমকা থেকে সাঁওতালের দল।

গাঁয়ের বাগদী-কাহার-মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চ'লে যায়। বিশেষ ক'রে অজন্মা আকাঁড়া হ'লে সেবার দল বেঁধে চ'লে যায়, অজন্মা না হ'লেও ছু-ঘর এক ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউ

বা ফেরে এক পুরুষ পর। দল বেঁধে ফেরে এমনই ধারা বাহান্ন পঁউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে। ওরা এমনই ধারা সুখের পায়রা চিরকাল, দুঃখের ঘরে থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। সকল সুখের মূল যখন লক্ষ্মী, তখন এবার ওরা আসবে এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়েরা। সকালে বিকালে ঠুকঠুক ক'রে যায় ওদের পরিত্যক্ত পাড়াটার দিকে। প'ড়ো ভাঙা বাড়িগুলা খোঁজ করে, পাড়ার বাইরে বটবাগানের বটগাছগুলার তলার দিকে চায়। এখানে খোঁজ করে, নতুন আগন্তুক কেউ এল কি না। এ গ্রাম থেকে পালিয়ে যেমন এখানকার ওরা অন্য গ্রামে যায়, তেমনই অন্য গ্রামের তারাও তো এ গ্রামে আসতে পারে! তেমন যারা আসে, তারা প্রথম বাসা পত্তন করে এই বটবাগানে কোন গাছের তলায়। কিন্তু কেউ আসে নাই আজও পর্য্যন্ত। পাল মশায়দের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। থই-থই-করা মাঠ-ভরা ধান এ তারা তুলবে কি ক'রে? রাত্রে ঘুম পর্য্যন্ত হয় না।

*   *   *

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্ব্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। মাথায় গামছা বাঁধে কম্ফর্টারের মত। নাক দিয়ে টপটপ ক'রে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠায় কোনমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধ'রে ডান হাতের কাস্তে টানে।

মুকুন্দ পালের কৃষাণ কাল থেকে জ্বরে পড়েছে। পালকে আজ নিজেই আসতে হয়েছে মাঠে। কিন্তু কাস্তে যেন চলছে না। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে কোমরে টান ধ'রে অসহ্য বেদনায় টনটন ক'রে উঠছে। যেন কোমরের দড়ির মত শিরাগুলা শুকিয়ে কাঠির মত শক্ত হয়ে গেছে; হাড়ের গাঁটে গাঁটে জ'মে গেছে বালিতে মাটিতে জমাট-বাঁধা পাথরের চাঁইয়ের মত। পাল কোমরে হাত দুটি রেখে আস্তে

আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে থাকা যত কঠিন, হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোও তেমনই কঠিন। শাঁখের করাত যেতেও কাটে আসতেও কাটে, কোমরের ভিতর যেন শাঁখের করাত চলছে মনে হচ্ছে।

হায় ভগবান! পাল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটুকুর দিকে চেয়ে দেখে আপনার মনেই বললে, হায় ভগবান! শুধু আক্ষেপই নয়, নিদারুণ লজ্জায় তার মাথাও হেঁট হয়ে আসছে। আপনার কাছেই মাথা হেঁট হচ্ছে। কতটুকু কেটেছে সে! তালপাতার বোনা চ্যাটাই, লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়াই আড়াই হাত, এখানে বলে তালাই; এক তালাই-ভোর জমির ধানও কাটা হয় নাই।

হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল এল। তার পুরানো কথা মনে প'ড়ে গেল। ছেলেবেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত—গাঁদা। যৌবনে মুরুব্বিরা তার নাম দিয়েছিল—ভীম। প্রৌঢ়ত্বে লোকে বলত —মোটা মোড়ল, এখনও বলে। মনে প'ড়ে গেল পুরানো আমলের ধান কাটার কথা। সে সব আজ কাহিনী মনে হচ্ছে। এমন মাঠ-থইথই-করা ধান এবারেই নতুন নয়। কতবার হয়েছে। ভোরের আকাশে শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করত আঁধার ঘরের মানিকের মত। উত্তর দিক থেকে শিরশির ক'রে ব'য়ে যেত হাড়-কনকনানি ঠাণ্ডা বাতাস। গাছ-পালার পাতা থেকে গাছতলার শুকনা পাতার উপর সত্যি সত্যি টপটপ্ শব্দে শিশির ঝরত; ঘাসের উপর পা দিলে গোড়ালি পর্য্যন্ত ভিজে যেত। পথের ধুলার উপর পাটালির মত এক পুরু ধূলা শিশিরে ভিজে জ'মে থাকত, পা দিলে ভেঙে যেত। ধানের মাঠে এলে শিশিরে-ভেজা নরম ধানের গাছে সে গন্ধ বেলায় এসে আজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে গন্ধ মনে আছে তার। সে ভোর থেকে আরম্ভ হ'ত ধান কাটা।

পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে; এ হাতের গ্রাসে, লোকে বলে, একপো চালের ভাত উঠে। একপো কি আর উঠে?

লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠায় সে খপখপ ক'রে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতের কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত; তার এই মুঠার তিন মুঠা ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হোক, দেড়া মোটা হ'ত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়খড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত শেষ ক'রে ফেলত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি ক'মে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্য্যন্ত সে এক পহর বেলা পর্য্যন্ত আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই কটা মাসে এ কি হ'ল তার?

কি কত্তা, ডাঁরিয়ে রইচ যে? কি হ'ল?

আপনার ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল পাল, তার মন উদাস হয়ে সেকালের সেই আমলে চ'লে গিয়েছিল, মধ্যে মধ্যে এই জমিখানাই যেন দেখাচ্ছিল সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্য্যন্ত আঁটি আঁটি ক'রে সাজানো রয়েছে কাটা ধান ক্ষেতের লালচে মাটি দেখা যাচ্ছে, লালচে মাটির উপর কাটা ধানের গোড়া জেগে রয়েছে লাল রঙের দাবার ছকের উপর সাদা রঙের ঘুঁটির মত।

পিছন থেকে কে ডেকে কথা বললে। পাল ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিও ক'মে এসেছে। গেল বছর পর্য্যন্তও পাল বিনা চশমায় চট-সেলাই-করা সূচে শণের সুতলির দড়ি পরিয়েছে, বস্তার মুখ সেলাই করেছে। কিন্তু এই বছরের এক ধাক্কাতেই বেলা কাবার ক'রে দিলে, চারিদিক ঝাপসা। তুলসীতলায় পিদিম জ্বালার সময় হয়ে এল আর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, কে?

আমি গো। চিনতে পারছ না নাকি?

পালের এবার খেয়াল হ'ল, ছোকরা মানুষের গলা; মুহূর্ত্তে সে চিনতে পারলে ছোকরাকে। মন তার বিষিয়ে উঠল।

নজর গেল তা হ'লে কত্তা। আমি গো, চিকেষ্ট!

চেকা?

হ্যাঁ গো; বলি ডাঁরিয়ে রইচ যে?

তুই কোথা যাবি? মাঠ থেকে পালিয়ে এলি নাকি? জ্বর এল?

জ্বর? চিকেষ্ট হি-হি ক'রে হাসতে লাগল। জ্বর-ফর আমার কাছে ঘেঁযে না। সেই তোমার আশ্বিন মাসে একবার। তার পরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পালের বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, সাপের গজরানির মত, নিশ্বাসের সঙ্গেই সে বললে, হুঁ।

মদ আর মাংস ও হ'ল জ্বরের যম। বুয়েছ? হি-হি ক'রে আবার হাসতে লাগল চেকা।

তা যাবি কোথা, যা না কেন? ফ্যাকফ্যাক ক'রে হাসতে বুঝি মজা লাগছে আমার ছামনে ডাঁরিয়ে?

চেকা আবার হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললে, যাচ্ছি তোমার ওই মাঝের জোলে পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চকে—তোমার দরুন গো। এখান সারা হয়ে গেল।

পাল হঠাৎ হেঁট হয়ে ঘসঘস শব্দে আবার ধান কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে, চেকার কথার ওই 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘে তোমার দরুন' কথাটা তপ্ত লোহার শলার মত পালের বুকে যেন বিঁধে গিয়েছে। ওই জমিটা চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পালের কাছ থেকে কিনেছে এই বৎসরেই বর্ষার ঠিক আগে। ধানের দর আঠারো টাকা, চাল তিরিশ, পালকে বাধ্য হয়ে বেচতে হয়েছে। চেকা বোধ হয় খোঁচা মারবার জন্যেই কথাটা বলেছে। খোঁচাটা লেগেছেও পালেব বুকে।

চেকা তবু গেল না। দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। বললে, সেই সকাল থেকে এই এক তালাই কাটলে নাকি?

পাল এ কথারও কোন উত্তর দিলে না। সে ধান কেটেই চলল। চেকার এ কথার মধ্যেও হুল আছে।

কত্তা!

পালের কোমর আবার কনকন ক'রে উঠেছে; মনের জ্বালার উপর শরীরের যন্ত্রণায় পাল এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল দেহের উপর একটা হ্যাঁচকা টান মেরে, মট ক'রে শব্দ হ'ল হাড়ে। পাল রাগে অধীর হয়ে উঠল, কেনে রে শালা, কেনে? কি, বলছিস কি?

চেকার হাসি বেড়ে গেল, সে চটপট শব্দে বার কয়েক বাই ঠুকে বললে, হবে নাকি, এক হাত হবে নাকি এই ধানের গদির ওপর?

ব'লেই সে আর দাঁড়াল না, নিতান্ত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে একটা গান ধ'রে সে চ'লে গেল। পাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে এবার তার জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

মুকুন্দ পাল—এককালের ভীম, প্রৌঢ় বয়সের মোটা মোড়ল, তাকে ঠাট্টা ক'রে গেল শ্রীকৃষ্ণ—চেকা! সম্বন্ধে সে অবশ্য মুকুন্দের নাতি, সম্বন্ধটা ঠাট্টারই বটে; কিন্তু এ ঠাট্টা মুকুন্দের পক্ষে মর্ম্মান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। উঠানে গোলায় গোলায় ধান আছে, ঘরে টাকা আছে। 'মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু' বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই-করা খত আছে ওর ঘরে। 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চক' ব'লে সেই কথাটা চেকা ঠাট্টা ক'রে ব'লে গেল। ওতে পাল ব্যথা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু ওর উপর হাত নাই। ও দুঃখ মনে মনেই চেপে রেখেছে মুকুন্দ। কিন্তু ও যে ওই বাই ঠুঁকে ব'লে গেল, হবে নাকি এক হাত? ওর অর্থ হ'ল, মুকুন্দের শরীরের এ অবস্থা দেখে সে তার সঙ্গে একদফা কুস্তি লড়তে চেয়ে গেল।

এ-কালের ছোকরাদের মধ্যে চেকাই হ'ল সকলের চেয়ে বড় জোয়ান। পালের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে পড়ল, বছর

আষ্টেক আগে আমুতির লড়াইয়ের আখড়ায় যখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আছাড় দিয়ে আখড়ার মাটির উপর বাই ঠুকে প'ড়ে ছিল, তখন হাসতে হাসতে মুকুন্দ গিয়ে বলেছিল, কই, আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয় এক হাত।

অন্য পাঁচজনে, বিশেষ ক'রে যগন্দ (যোগেন্দ্র) ঘোষ, তার হাত ধ'রে টেনে বলেছিল, ছি ছি ছি! তোমাকে নাকি লড়তে হয় ওই বালকের সঙ্গে! ছি!

শঙ্কিত হয়ে বারণ করেছিল সবাই, পালের শরীরের যা ওজন, তাতে সে যদি চেকার উপর কোনমতে চেপে পড়ে, তা হ'লেই ছোঁড়াটা ঘায়েল হয়ে যাবে। শঙ্কিত হয় নাই শুধু চিকেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এই, হট যাও সব, লড়ব আমি। চেকার স্পর্দ্ধা চিরকালের। পাঁয়তাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে আবার সে বলেছিল, মোটাকে সাথ আঁটা লড়েগা, হট যাও। পালের দেহখানা প্রকাণ্ড ব'লে, এবং লোকে তাকে 'মোটা মোড়ল' বলে ব'লে, সেই দশের সামনেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—আঁটা, অর্থাৎ আঁটসাঁট-দেহ তরুণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সে গরম জল হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ তাকে পাঁজাকোলা ক'রে কোলে তুলে ধ'রে গোটা আখড়াটার চারিধার ঘুরে আখড়ার উপর ফেলে দিয়েছিল--বেশ একটু জোরেই ফেলে দিয়েছিল।

তাই আজ চেকা মোড়ল তাকে ঠাট্টা ক'রে গেল। বাই ঠুকে আস্ফালন ক'রে লড়াই করবার জন্যে প্রায় হাঁক মেরে ডাক দিয়ে গেল।

হায় ভগবান! কি কাল জ্বর তুমি দুনিয়ায় পাঠালে! রক্ত জল ক'রে দিলে, মাংস সব যেন চিবিয়ে চিবিয়ে লোল করে দিলে, হাড়ে পর্যন্ত ঘুণ ধরিয়ে দিলে। চোখের দৃষ্টি গেল। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। দু পা জোরে হাঁটলে হাঁপাতে হয়। নইলে সে তো বুড়ো নয়। ষাট বছর বয়স এমন কি বয়স? তার বাপ

পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাঁচসেরী কোদাল চালিয়েছে জোয়ান কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে? নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ এ কি হ'ল? হায় ভগবান! বুড়ো ক'রে দিলে?

কি? চলেছে না হাত? দাঁড়িয়ে আছ?

কে?

আমি।—সকরুণ কণ্ঠে বললে যগন্দ ঘোষ, আমিও পারলাম না। ফিরে এলাম।

যগন্দ! এ কি হ'ল ভাই যগন্দ?

যগন্দ বললে, লা এসে ঘাটে লেগেছে। আর দেরি নাই। যগন্দর গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

যগন্দ এগিয়ে এসে বললে, তামাক খাও।

আলের উপর দুজনে বসল। মুকুন্দর হাতে হুঁকো ধরাই রইল। সে যেন বড় ভাবছে।

যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিলে, খাও।

হুঁ। হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে, লায়ে পার হতে তো ভয় নাই যগন্দ, 'হরি' ব'লে নাপিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম, তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যাঁ হে, তিন চার মাসে একটা জ্বরে এ কি হ'ল বল তো?

বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, চেকা আমাকে বাই ঠুকে ব'লে গেল যগন্দ, এক হাত হবে নাকি। আমাকে ঠাট্টা ক'রে গেল!

রোদ উঠেছে। শীত কেটে এসেছে। হাত-পা কোমরের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা! হটাৎ মুকুন্দ গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ফেললে।

যগন্দ বললে, করছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে।

উহুঁ। আমার সহ্য হচ্ছে না। গা ঘামছে। দেখ তুমি।

যগন্দর কিন্তু ততখানি উৎসাহ হ'ল না। সে বললে, মাঠে ব'সে আর কি করবে? চল, বাড়ি যাই।

তুমি যাও যগন্দ। আমার ভাই, ভূঁইখানা না সারলে চলবে না। কৃষেণ ছোঁড়ার জ্বর।

যগন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে, সকাল থেকে তো দেখলে, আবারও সাধ হচ্ছে তোমার?

যাও, যাও হে, তুমি যাও।

মুকুন্দ আবার নেমে পড়ল মাঠে। যগন্দ চ'লে গেল। রোদের তাপ এসেছে, বেদনা-ভরা সর্ব্বাঙ্গে যেন মিঠা মিঠা সেক লাগছে। আরাম পাচ্ছে মুকুন্দ। আ-হা-হা, হে দেবতা, তোমার মত এমন মহিমা আর কারও নাই! তোমার রোদে পাঁশুটে ধানগাছে সবুজ রঙ ধরে, তোমার যত রোদ তত জল, তোমার তাপে আড়ষ্ট দেহে জোর ফিরে আসছে, গাঁঠে গাঁঠে বুড়ো বয়সের পুরু চর্ব্বি গলছে। মুকুন্দ হাত দুটা উপরে তুললে, বার কয়েক ভাঁজলে, কব্জি থেকে হাতের মুঠাটা ভাজলে, বার কয়েক বসল উঠল। কিন্তু হাঁপ ধরেছে। ধরুক। তবু তার মনে হ'ল, সে যেন অনেকখানি সক্ষমতা ফিরে পেয়েছে—হ্যাঁ অনেকখানি।

হেঁট হয়ে সে আবার ধানের গোড়া মুঠোয় চেপে ধরলে। কাস্তে চলতে আরম্ভ করল।

* * *

ওরে বাস রে! এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে!—বছর বাইশের একটি মেয়ে, এক হাতে জলখাবার, অন্য হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুকুন্দ ধান কেটে চলেছিল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ধান কাটার চেয়ে তার দেহখানাই যেন বেশি চলছিল। ভাঙা কল চলে, তাতে যেমন কাজের চেয়ে কলটা ঝাঁকুনি খেয়ে

নড়ে বেশি, শব্দ হয় জোর, তেমনিধারা কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল বেশি। সে কিন্তু মুকুন্দ বুঝতে পারছিল না। সে কাজ ক'রেই চলেছিল। হঠাৎ মেয়ের গলায় ওই কথাটা শুনে, সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠল। সমস্ত মাঠখানায় ওই নদীর ধার পর্য্যন্ত তবকে তবকে যেন সে হাসির প্রতিধ্বনি বিছিয়ে গেল। মোটা গলায় সে ছড়া কাটলে—

"সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে
ভরিবে গোলা।
আমার সোনামুখীর হবে
সোনার কাঠির মালা।"

ওই, তোমার হ'ল কি আজ বুড়ো বয়সে ?—মেয়েটি বললে। সে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দ চমকে উঠল। মুহূর্ত্তে তার হাসি থেমে গেল। মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত। তার অকস্মাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল আগে তখন তার বয়স ত্রিশ। উনত্রিশ বছর বয়সে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। একুশ বছরে গিয়েছিল প্রথম স্ত্রী, পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় জনা, একটি দু-বছরের মেয়ে রেখে গিয়েছিল ; উনত্রিশ বছর বয়সে তৃতীয় জনা। লোকে বলত, মুকুন্দ পাল অজগর পুরুষ ; বিয়ে হ'লেই নির্ঘাত খাবে। মুকুন্দও এটা বিশ্বাস করেছিল। গণৎকারেও তাই বলেছিল, রাক্ষসগণ, পত্নীস্থানে শনি মঙ্গল রাহু ; শিবের সাধ্যি নাই তোমার পরিবার রক্ষা করতে। মুকুন্দ নিজের হাতের তালুর কড়ে-আঙুলটার নীচে স্পষ্ট দেখেছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। তাই সে আর বিয়ে না ক'রে ঘরে এনেছিল পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের বাবুদের বাড়ির একটি বিধবা তরুণী ঝিকে। ব্রাহ্মণবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, জলচল জাতের মেয়ে, তাতে আর ভুল নাই ; তবু 'অধিকন্তু নো দোষায়'—মুকুন্দ তাকে বৈরাগীদের আখড়ায় কণ্ঠী

পরিয়ে বৈষ্ণবী ক'রে পেড়ে-শাড়ি, হাতে চুড়ি পরিয়ে ধ'রে এনেছিল। ত্রিশ বছর আগে এমনই ক'রে সে আসত জলখাবার নিয়ে। তেরো শো বিশ সালও ছিল একটা শূন্যের বছর, সেবারও হয়েছিল এমনই বান, এমনই ধান। হয় নি শুধু চালের মণ তিরিশ টাকা, আর হয় নি এমন কাল জ্বর। সেবার সে ধান কাটছিল মাঠে। সে এসে বলেছিল ঠিক ওই কথাটি, ঠিক ওই কটি কথা। মুকুন্দ এমনই ক'রে হেসেছিল আর ওই ছড়াটি কেটেছিল। আজও সেই রকম মাঠ-ভরা ধান। আজও সে যেন ঠিক তেমনই হুসহুস ক'রে ধান কেটে চলেছে, এমন সময় তেমনই ভাবে এসে দাঁড়িয়ে সেই কথা কয়টি বলায় মুকুন্দের ভুল হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীও অনেককাল আগে ম'রে গেছে। মুকুন্দ বলে, গত হয়েছে।

এ মেয়েটি মুকুন্দের নাতনী—মেয়ের মেয়ে। সম্বন্ধ ঠাট্টার। কিন্তু মুকুন্দ কখনও ঠাট্টা করে না। একটি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েটি পনরো বছরে বিধবা হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে। মুকুন্দ জীবনে ছুটি শিশুকে কোলে ক'রে মানুষ করেছে, প্রথম তার নিজের মেয়ে, তারপর এই নাতনীকে। নাতনীর ছেলেকে সে কোলে করে না। না, কাজ নাই।

॥ দুই ॥

মুকুন্দ বাড়ি এসে ব'সে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তাতে তার মেজাজ খারাপ হয় নি। শরীর এলে মেরে গিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন অসুখ বোধ করছে না। কাজ সে অনেকটা করেছে, অনেকটা। সে খুশি হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে, সে বুড়ো হয় নাই। আসল দরকার ওষুধ আর খাওয়া দাওয়ার, আর দরকার কাজের অভ্যাসের।

মেয়ে লক্ষ্মী এসে বাপকে দেখে কিন্তু শিউরে উঠল, বললে, বাবা, তোমার কি শরীলের ওপর এতটুকুন মায়া-মমতা নাই? মুখের চেহারা কি হয়েছে দেখ দেখি! সরস্বতী বলছিল—

কি বলছিল সরস্বতী?

লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী। পাল মশায়ের সেই নাতনীটি। লক্ষ্মী বললে, বলছিল, কত্তাদাদা ধান কাটছে, বাবা রে বাবা, একটা জোয়ানের সাধ্যি নাই এমন হাঁইহাঁই ক'রে কাটতে!

পাল হা-হা ক'রে হেসে উঠল! মাঠে আজ যে হাসি হেসেছিল, সে হাসি সে জোয়ান বয়সে হাসত; যে হাসি সে সরস্বতী বিধবা হবার পর আজকের আগে আর হাসে নাই, সেই হাসি। হাসির আওয়াজের ধাক্কায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঁসার বড় খোরাটায় মৃদু প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। বাবার হ'ল কি?

তোর বেটী বলে কি লক্ষ্মী, আমাকে বলে বুড়ো! তাই—। সে আবার হা-হা করে হেসে উঠে বললে, তাই তোর বেটীকে শুনিয়ে দিলাম সেই ছড়াটা, যে ছড়া বলতাম তোর মাকে।

লক্ষ্মী হাসলে।

পাল বললে, জানিস মা, এবার ধান যা হয়েছে! আ-হা-হা! ধান নয় মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এবারে খামারে বোধ হয় ধান বাঁধতে

জায়গাই হবে না। তা ছাড়া গরু দুটোর যা হাল হয়ে আছে, তাতে—

পাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কেলের জন্য ভাবি না। ও আমার ঠিক আছে। ও আমার ক্ষণজন্মা। ভাবনা বাছুরটার জন্যে। হাজার হ'লেও কাঁচা হাড়।

কেলে, পাল মশায়ের প্রিয়তম হেলে বলদ। একেবারে শৈশব থেকে তাকে পাল পালন করেছে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ভরা বয়সে কেলে ছিল এখানকার বিখ্যাত হেলে। পাল একা নয়, এখানকার সকল চাষীতেই একবাক্যে বলে, কেলে ক্ষণজন্মা গরু। একা কেলের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে একে একে চারটা বলদ অকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। গতবার আবার একটা বাছুর অর্থাৎ সদ্য জোয়ান বলদ কেনা হয়েছে। কিন্তু আজও সে কেলের ডাইনে বইতে পারে না। এবার দুটা বলদেরই 'খুঁড়িয়া' হয়েছিল গো-মড়কের সময়। দুটাই ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছে। পাল কেলের জন্য ভাবে না। ভাবনা তার ওই নতুন সদ্য জোয়ান হেলেটার জন্য।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পাল বললে, চেকা আমাকে আজ বাই ঠুকে ঠাট্টা করলে মা।

কেউ উত্তর দিলে না। পাল পিছনে তাকিয়ে দেখলে, লক্ষ্মী নাই সে চ'লে গিয়েছে।

পাল উঠে গিয়ে দাঁড়াল কেলের কাছে। কেলে ফোঁস ক'রে একটা নিশ্বাস ফেলে পালের দিকে চাইলে, তার গা শুঁকলে, তারপর ঘাড়টা লম্বা টান ক'রে মুখটা এগিয়ে দিলে মুকুন্দের বুকের কাছে। এর অর্থ হ'ল, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। পাল হেসে তার গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে দুটা চপড় মেরে বললে, দেখব বেটা এবার কেমন ক্ষ্যামতা তোমার! হ্যাঁ।

তারপর আবার বললে, দাঁড়া না, তাজা করে দিচ্ছি। রশির

মেয়ার ব্যবস্থা করছি আজ থেকে। রশি হ'ল ধেনো মদের সবচেয়ে কড়া তেজী অংশ। মেয়া হ'ল তারই পচানো জিনিসের ছিবড়ে। ভারী উপকারী আর পোষ্টাই গরুর পক্ষে। চেকা মোড়ল নিজে খায় 'গৃহজাত' অর্থাৎ ঘরে চোলাই করা মদ। গরুদের খাওয়ায় রশি মেয়া। একেবারে তাগড়া হয়ে আছে চেকার গরুগুলা ; চেকা খায় মদের সঙ্গে মাংস। হাঁস আছে একপাল, হাঁসের বাচ্চা খায়।

কি করছ কত্তা ? সরস্বতী দাঁড়াল এসে দাওয়ার উপর। খেতে দিয়েছি তোমার কেলেকে, উপোস করিয়ে রাখি নাই।

কি ?

এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতে-দেতে হবে না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

পাল এসে বসল। তেলের বাটিটা এগিয়ে দিলে নাতনী। পাল বললে, এক কাজ কর্ দিকিনি। ত্যালটা গরম ক'রে নিয়ে আয় দিকিনি।

গরম তেল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করতে ব'সে সে আবার ডাকলে, সরস্বতী।

কি ?

এই পিঠে খানিক ত্যাল মালিশ ক'রে দে তো বুন। খুব ক'রে, আচ্ছা ক'রে। উঁহু, উ তোর হচ্ছে না। আরও জোরে।

আর আমার জোর নাই বাপু।

পাল হা-হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা গোটাকতক কিল মার দিকিনি। যত জোর আছে তোর! আচ্ছা! আচ্ছা! আচ্ছা!

আমার হাতে লাগছে বাপু, আর আমি পারব না। সরস্বতী সত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাল আবার হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আমার কিন্তু তোর নরম হাতের কিল ভারী মিষ্টি লাগছে।

সরস্বতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কর্ত্তার মুখে এই ধারার কথাবার্ত্তা কখনও শোনে নাই! হ'ল কি কর্ত্তার!

* * *

মাকে বলল সরস্বতী, কত্তার গতিক ভাল নয় মা।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। কথাটা তারও মনে হয়েছে। বাপের সেই হাসি শুনে। এ হাসি সে শুনেছে ছেলেবেলায়। বাপকে তখন লোকে বলত—ভীম। সন্ধ্যার পর বাইরের দাওয়ায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে তার বাবা এমনই ভাবে হাসত; সে তখন ছোট মেয়ে, বাড়ির ভিতরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমাত, বাবার হাসিতে তার ঘুম ভেঙে যেত।

বৈষ্ণবী মা বকত বাবাকে, কি এমন ক'রে হাসো, মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়, চমকিয়ে ওঠে।

বাবা আবার হাসত হা-হা ক'রে। কাঁসার বাসনে খনখনে আওয়াজের রেশ বেজে উঠত, দরজায় কি জানালায় হাত দিয়ে থাকলে মনে হত, কি যেন একটা শিউরে উঠছে তার ভিতরে। সে হাসির প্রথম পর্দ্দা ছিঁড়েছিল বৈষ্ণবী মা যাবার পর। তারপর খাদে নেমেছিল লক্ষ্মী নিজে বিধবা হবার পর, সরস্বতী বিধবা হবার পর সে হাসি আর হাসে নাই তার বাবা। আজ সেই হাসি শুনে কথাটা তারও মনে হয়েছে।

সরস্বতী বললে, কত্তা হয়তো আর বাঁচবে না, নয়তো কত্তার মাথা খারাপ হয়েছে।

লক্ষ্মী শিউরে উঠে বললে, ও কথা বলিস না সরস্বতী। তা আমাদের দশা কি হবে, ভাব দেখি।

সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চ'লে গেল সেখান থেকে।

লক্ষ্মী চুপ ক'রে ব'সে ভাবছিল। যতই অশুভ হোক, সরস্বতী কথাটা মিথ্যা বলে নাই। আজ সন্ধ্যাবেলায় বলদ দুটাকে রশি আর মেয়া খাওয়াবার ঝোক উঠেছে। নিজে বৈষ্ণব মানুষ, মদকে যার

এত ঘেন্না, সেই লোক নিজে হাতে ওই সব জিনিস ঘেঁটেছে। বলদকে মেয়ারশি অনেকবারই খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু সে সব করত রাখালে। বাবা নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। সেই লোক নিজে হাতে এই বুড়ো বয়সে—! চোখে জল এল লক্ষ্মীর। রাখাল নাই, কিন্তু কাহারপাড়ার কাউকে ডাকলেই হ'ত! এ কি মতিভ্রম।

একটু ব'সে থেকে সে উঠল। উৎকণ্ঠা এবং কৌতুহলও হ'ল বাবা কি করছে দেখবার জন্য। সে চুপিচুপি বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে গেল কোঠার উপরে ধুপধাপ শব্দ শুনে। যেন দুবমুস দিয়ে কাঠের তক্তার উপব মাটি বিছানো মেঝেটা পিটছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল। তার বাবা কুস্তিগীরের মত কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক দিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীবে লক্ষ্মী নেমে এল। হায় রে! এই বয়সে বাবা শেষে পাগল হয়ে গেল!

॥ তিন ॥

শুধু মেয়ে আর নাতনীই নয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই কেমন যেন একটু খটকা লেগেছে। পালের হ'ল কি? তার ওই হা-হা ক'রে হাসি শুনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে জলখাবার বেলা পর্য্যন্ত পাল মাঠে ধান কাটে। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। পালের কৃষাণটার জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বুকের দোষ হয়েছে, আধা-ডাক্তার আধা-কবরেজ ভাগবতচরণ বলেছে 'মারে হরি রাখে কে?' লোকটা মরবে। আজও পর্য্যন্ত বাগদী-কাহার যারা বর্ষার সময় চ'লে গিয়েছে, তারা কেউ ফিরে নাই। ডুমকার ওদিক থেকে একটি দল সাঁওতালও আজ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে আসে নাই। বর্দ্ধমানে দামোদরের বাঁধ তৈরি হচ্ছে, রেলের সাঁকো তৈরী হচ্ছে, সারি সারি ক্রোশ বরাবর লম্বা, এক-একটা সাঁকো; উড়ো জাহাজের আস্তানা তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে-সেখানে—কোনটা ছ ক্রোশ, কোনটা পাঁচ ক্রোশ লম্বা; লাখে লাখে মজুর খাটছে টাকাটার কমে মজুরি নাই, পাকা মেঝে ঘর দিচ্ছে নাকি থাকতে, ডাক্তার-ওষুধের পয়সা লাগে না, এই ঢাউস বড় বড় মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যায়, আবার মোটরে ক'রে দিয়ে যায়। সাহেবেরা সেখানে সন্ধ্যার পর নাচ গান হল্লা করে। মোটা মোটা বকশিস দেয়। ভাল ভাল বিলাতী মদের বোতল নাকি গড়াগড়ি যাচ্ছে, টিনে বন্ধ খাবার; এসবেরও প্রসাদ কি আর কিছু কিছু না পায় তারা? সব—সব মজুর গিয়ে সেখানে জুটেছে! কিসের জন্য এখানে আসবে?

নিজের নিজের ধান নিজে না কেটে উপায় কি? কাটেও তো তারা চিরকাল। এবার না হয় রোগ ধরেছে; কাল রোগ। তবু তো ধান তুলতে হবে! মাঠ-ভরা ধান, গোটা বছর রত্নাকর মুনির মত

উইকে একপিঠ ভুঁইকে একাপিঠ দিয়ে তপস্যার ফসল, লক্ষ্মীর আটনের দেবতা, গোটা বছরের মুখের ভাত, চালের খড়, আহার—এ তো তুলতে হবে। ঘরের খাবার খাঁ-খাঁ করছে, লক্ষ্মীর আটন খালি প'ড়ে আছে, গোলার মধ্যে চামচিকেতে বাসা বেঁধেছে, মাকড়সায় জাল বুনেছে ; ঝেড়ে মুছে নিকিয়ে পরিষ্কার ক'রে সব পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। তুলবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছেও সবাই। কিন্তু পালের ধান কাটা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। পাল ধান কাটে আর আপন মনেই বলে, হেঁই-হেঁই-হেঁই। পা ফেলে যেন রোখা মাতালের মত। পাল কিছুদিন আগেও উঠত ধীরে ধীরে, বলত, আর কি সেদিন আছে? তাড়াহুড়ো ক'রে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে। ব'লে হাসত। সেই পালের হঠাৎ যেন নবযৌবন হয়েছে। এ তো ভাল নয়। এমন ক'রে খাটতে গেলে কোনদিন বুক ধরফড় ক'রে মাঠেই মুখ গুঁজে পড়বে, আর উঠবে না। না হয় তো খাটুনির ধমকে পালটে পড়বে জ্বরে। এর উপর জ্বর হ'লে মেরে দিয়ে যাবে, নাও যদি মরে, তবুও উঠে আর হেঁটে বেড়াতে দেবে না সহজে।

তার উপর এসব কথা বললেই ওই হাসি।

যোগন্দ বললে, কি হল কি তোমার, বল দেখি?

পাল সেই হাসি হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, সন্ধ্যেবেলায় বলব।

ওরে বাপ রে! এত হাসি কিসের গো কত্তা?

গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছে পাল চেকা মোড়লকে। পিছন ফিরে দেখলে, চেকা পালই বটে। পাল ভুরু নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে, পারিস? বলি, তুই পারিস?

কি?

এমনই হাসতে? মরদ তো বটিস। জোয়ান বয়সও বটে, পয়সাও ঢের আছে। পারিস? কয়েক মুহূর্ত্ত সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেকার

দিকে চেয়ে থেকে আবার বলবে, ফুসফুসি ফেটে যাবে কোলা-ব্যাঙের পেটের মত।—ব'লেই সে আবার হাসতে আরম্ভ করলে সেই হাসি।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার আর কোন রকম সংশয় রইল না, পালের মাথার সত্যিই গোলমাল হয়েছে। চেকাও প্রথমটা চুপ ক'রে ছিল। একটু পর সে বললে—পালকে কোন কথা না বলে যোগেন্দ্রকে বললে, ঘোষ-কত্তার নাকটা দেখেছ?

যোগেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়েই তার মুখের দিকে চাইলে। পালের ভুরুও কুঁচকে উঠল। চেকা যে এবার বাঁকা বঁড়শির মত কথা বলবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। চেকাকে তারা চেনে। টাকার গরমে মাটিতে ওর পা পড়তে চায় না ওর কথায় জলের মাছ গায়ের জ্বালায় ডাকায় মাথা ঠুকে আছার খেয়ে পড়ে।

চেকা বললে, দেখ, ভাল ক'রে দেখ! হুঁ, হুঁ, ঠিক।

কি?

বেঁকেছে। কত্তার নাকটা বেঁকে গিয়েছে।

নাক বেঁকে গেলে মানুষের ছ মাসের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। নীল তারা দেখতে পায় না চোখ টিপে, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পায় না এমনই নাকি অনেক কিছু হয়। চেকার কথা শুনে যোগেন্দ্র শিউরে উঠল। সে তার ঘোলাটে চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ ক'রে চাইলে পালের মুখের দিকে। পালও চমকে উঠল, তার ডান হাতে ছিল কাস্তে, বাঁ হাতটা অপনি যেন গিয়ে পড়ল নাকের উপর।

চেকা হি হি ক'রে হেসে উঠল। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী। হাসির ধমকে তার মাথাটা যেন মাটিতে ঠেকে গেল প্রথমটা, হাসির ধমকেই আবার যেন, সোজা হয়ে উঠে পিছনের দিকে উলটে প'ড়ে যাবার উপক্রম করলে।

চেকা বললে, ছ মাস। আর ছ মাস। ব'লেই সে চলতে আরম্ভ করলে। কিছুদূর গিয়েই সে আবার দাঁড়াল, বললে, মরণের ছ

মাস আগে, বুঝলে কত্তা, মানুষের এমনই নব-যৌবন হয়। বুঝলে ?

পাল আবার উৎকটভাবে হেসে উঠল, নিজের বাই দুটোতে চাপড় মেরে বললে, হবে নাকি।

চেকা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চ'লে গেল। পাল তার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, যগন্দ !

কেউ সাড়া দিলে না। যোগেন্দ্র চ'লে গিয়েছে।

পাল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকে হাত দিলে।

কত্তা, আজ যে ডাঁড়িয়ে রইছ ?

সরস্বতী। সরস্বতী এসেছে জল খাবার নিয়ে।

হুঁ।

হুঁ কি ? শরীল ভাল আছে তো ?

দেখ্ তো সরস্বতী, নাকটায় কি হ'ল ?

কি হ'ল ? কই, কিছুই তো হয় নাই।

যেমন ছিল তেমনই আছে ?

সরস্বতী খুব কাছে এসে খুব ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, কই, কিছুই তো—। উঃ, কত্তা, কি খেয়েছ তুমি কত্তা ? সরস্বতী শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

* * *

লক্ষ্মী বললে মেয়েকে, চুপ কর্, এ কথা কাউকে যেন বলিস না।

পাল কিন্তু নিজেই জানালে যোগেন্দ্রকে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে ডাকলে, শোন, এস।

কোথা ?

এস না আমার সঙ্গে।

গাঁয়ের বাইরে বটবাগানে একটা গাছতলায় বসল পাল, যোগেন্দ্রকে বললে, ব'স।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করছিল। মাথা-খারাপ লোক, কখন কি ক'রে বসবে হয়তো।

পাল তাব গায়ের আলোয়ানের ভিতর থেকে বের করলে একটি বোতল, তার মুখেই পরানো ছিল কাচের ছোট ওষুধ-খাওয়ার গেলাস একটি।

কি? যোগেন্দ্রের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাল কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বললে, গৃহজাত। খাও।

সে কি?

গৃহজাত মানে লুকিয়ে ঘরে চোলাই করা মদ। সাওড়াপুরের ভল্লা-বাগদীরা তৈরি করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়। এ গাঁয়েরও দু-চারজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা ব'লে যোগেন্দ্র খাবে কি ব'লে? পালই বা খায় কি ব'লে? বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে ব'লে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়। আজ পালের এ কি আচরণ?

ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে ঢুক ক'রে ওষুধ খাওয়ার মত খেয়ে ফেলে পাল বললে, জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায়ে তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।

গেলাসটায় যোগেন্দ্রের জন্যই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সেই বললে, ওই শালা চেকা, চেকা শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে, আমার খানিক আশ্চর্য্যও লাগত, সবাই জ্বরে ওলটপালট খেলে, ওই শালার একবার বই জ্বর হ'ল না কেনে? তা শালাই আমাকে বললে, সেই হে, যেদিন বাই ঠুকে আমাকে ঠাট্টা করেছিল, সেইদিন। বলেছিল, মদ-মাস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেষতে পারে না। তা দেখলাম, হ্যাঁ, দৰ্ব্যিটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি। নাও, খাও।

যোগেন্দ্র সভয়ে স'রে বসল। বললে, না।

না লয়, খাও!

ছি ছি, ছি পাল, ছি। এই বুড়ো বয়সে—

ধেৎ তেরি! পাল ধমক দিয়ে উঠল। কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই, ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, আন ডেকে আমার কাছে। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্রের জন্য ঢালা গেলাসটি নিজেই সে খেয়ে নিলে!

আশী বছর। আশী বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ।

যোগেন্দ্র বললে, কিন্তু ধম্ম আছে তো।

হ্যাঁ, আছে বইকি। আলবৎ আছে। এ তো ওষুধ। ধম্মতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মতে বলে নাকি, ওষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে খকখক ক'রে কেসে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম! হঠাৎ সে নিজের হাতখানা শক্ত ক'রে যোগেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলে। দেখ, শরীরটা কদিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো, বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হ'ল, কারণ পাল এক ধমক হাতখানা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র। সত্যই, আর সে রকম তলতলে ঝলঝলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল।

হুঁ। তা হয়েছে।

পাল আবার খানিকটা গেলাসে ঢেলে বললে, তবে খা, খা রে খা। যৈবন ফিরে আসবে। ব'লে হা-হা ক'রে হেসে উঠল।

যোগেন্দ্র এবার হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হাসিতে চমকে উঠে বলেলে, না মাইরি, কি যে হাসছ! এখুনি কে এসে পড়বে। তা হ'লে অমি খাব না ভাই। পালের হাসি যেন শাঁখের আওয়াজ। কাছাকাছি শাঁখ বাজালে তার শব্দ যেমন কানের ভিতর থেকে মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে, কাঁধ থেকে হাতের শিরায় ধ্বনির রেশ তুলে টান হয়ে উঠে, পালের হাসির গমকগুলা তেমনই ভাবে যোগেন্দ্রের দেহের মধ্যে সুর তুললে। ভয়ও লাগল, আবার চঞ্চলও

হ'ল মন ; কত কথা মনে প'ড়ে গেল। যোগেন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও ভাবছিল। এঁ কি গন্ধ!

নাক টিপে ধর্ বাঁ হাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাস্ দে ঢেলে মুখে। বাস্—ব'লেই সে আবার হেসে উঠল হা-হা ক'রে।

এই, এই, না, এমন ক'রে হাসলে হবে না—না, না।

তবু থামল না পালের হাসি।

কিছুক্ষণ পর যোগেন্দ্রও হাসছিল পালের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। কথাটা অবশ্য হাসির কথা। পাল বলছে এবার পৌষ-লক্ষ্মীর দিনে ভাসান-গান করতে হবে, আগে যেমন হ'ত। আমাদের যে দল ছিল, সেই দলের ভাসান-গান। সেকালে পাল চন্দ্রচূড় সাজত, আবার পায়ে কালি-মাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে গোদা মালোও সাজত। পাল এখনও সেই দুটাই সাজতে চায়। আর যোগেন্দ্রকে বলছে, তুই বেউলো সাজতিস, তুই বেউলোই সাজবি।

এই বুড়ো বয়স, ভাঙা মুখ, ফোকলা দাঁত—এই চেহারায় বেউলো! যোগেন্দ্র হাসতে অরেম্ভ ক'রে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল।

হাসিটা থেমে এল ধীরে ধীরে। দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইল, ক্লান্ত হয়েছে দুজনেই ; যোগেন্দ্রের বুকে তো ফিক-ব্যাথার মত ধ'রে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নীরবতার অবসরে তাদের মনের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে পুরানো দিনের কথাগুলি। নিজেদের সেই যৌবন-কালের চেহারা মনে পড়ছে। সেকালের সঙ্গীদের যারা আজ নাই, তাদের মনে পড়ছে। শূরবীরের মত চেহারা সব, কত হৈ-হৈ সে! ভাবনা চিন্তা ছিল না।

হবে না কেন? খামারে সব গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে-ভর্ত্তি দুধ, জালায় জালায় গুড়, পুকুর ভরা মাছ—পৌষ-লক্ষ্মীতে সে কত সমারোহ, গামলা-ভর্ত্তি করে সরুচাকলি, আসকে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে! কুড়ি গণ্ডায় এক

পণ—সেই পণ দরুনে পিঠে খেত এক-একজন। মাঘ মাসে মূলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে 'মূলেমচ্ছি'—মূলোতে মাছে অম্বল হ'ত। তারপর পড়ত ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙিন পাটের কাপড় প'রে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত সরকারী চল্লিশ-বাতির আলো। শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শঙ্কর! শঙ্কর! আসর-খানা গমগম ক'রে উঠত। উঠবার কথা যে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ভৈরবমূর্ত্তির মত দশাশয়ী চেহারা, সেই বাঘা গলার আওয়াজ, লোকের বুকের ভিতর যেন গুরগুর ক'রে উঠত। মেয়েরা বসত একদিকে, পুরুষেরা বসত তিনদিকে, সব হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত চন্দ্রচুড়ের মুখের দিকে। মেয়েদের ঘোমটা খ'সে যেত। পুরুষদের হুঁকোর টান বন্ধ হ'ত। ধীরে ধীরে তাজা কল্কে নিবে আসত।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপ ছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি ছিল ডাগর; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোনকালেই যোগেন্দ্রের বেশি নয়, তাও কামিয়ে পরচুলো প'রে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনি রঙের পাটের শাড়িখানা প'রে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকে হাসত। পুরুষদের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মাঞ্জাসে সে নদীর জলে ভাসত, বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসঁরে আমার রান্না করা ভাত আছে, সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক, তুমি আমার বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে ব'লো, বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত, "জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা!" গোটা আসর হাপুস-নয়নে কাঁদত।

এমন সময়ে ঠোঁটের কোণে চুন মেখে, গালে কপালে চুনের দাগ এঁকে, পায়ে ন্যকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ভুঁড়ি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে নেচে আসরে ঢুকত গোদা মালো। পোশাক পালটে পালই

সাজত গোদা মালো ; দেখে কার সাধ্য যে বলে, এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদসদাগর। পালের ভুঁড়ি নাচানোর কায়দাটি ছিল অদ্ভুত। সত্যই যেন নাচত ভুড়িটি ; দেখে আসরসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত। মেয়েরা বাঁকা দৃষ্টি হেনে মুচকি হেসে বলত, মরণ ! পৌষ মাস চ'লে যেত, মাঘ মাসের অন্তত পনরোটা দিন ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই বলত, ওরে, গোদা মালো আসছে। তরুণীর দল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফিকফিক ক'রে হাসত।

সে দিন আর এ দিন ! আজকের দিনকালগুলা যেন ভাসান-গান ভাঙার পর শেষরাত্রের আসর। চল্লিশ-বাতির চিমনিটা কালো হয়ে যেত কালি প'ড়ে। পৌষের শেষরাত্রিতে হিম ঝরত চারিদিকে, চটতালাইগুলা ধূলোয় ধূলাকীর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে প'ড়ে থাকত ; আসর আগলে তারা জনকয়েক শুধু প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁকে চুরে শুয়ে থাকত ; ছু-চারটে কুকুরও এসে গা ঘেঁষে শুত ; খাঁ-খাঁ করত চারিদিক। ঠিক তাই। ঠিক তাই। তারাই কজন ভাঙা আসর আগলে বেঁকে চুরে কোনমতে প'ড়ে আছে। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল, বাড়ি চল।

চল। পালও উঠল।

বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু ছুজনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মলমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা বসুমতীকে কে ঢেকে দিয়েছে ! মদ অতি সামান্যই খেয়েছে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চম-চম করছে। পাল বললে, চল, মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু !

ছুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। ছুধ-বরণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। ছু-চোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।

পাল বললে, যগন্দ !

আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ শুয়ে আছেন, তুমি দেখ !

তাই বলছি যগন্দ, এইবার দিন ফিরল, তুমি দেখো।

যোগেন্দ্র কথাটার ঠিক কি মানে তা বুঝতে পারলে না। পালের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

পাল বললে, এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুখের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখো তুমি, সুখের কাল হবে, দেখো, আমি বললাম। এই তিরিশ টাকা মাহিনার এই মড়ক—এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা লক্ষ্মী আবার এলেন।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পাল বললে, দেখো তুমি, আবার আগের মত কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভ'রে ধান হবে। আবার সব তেমনই হবে। বস।

দুজনে বসল সেই শিশির ভেজা মাঠের আলের ঘাসের উপর।

পাল বললে, সাধে বলছিলাম যগন্দ, লক্ষ্মীর রেতে এবার ভাসানের গান করব। এবার মা লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে এবার সত্যি পৌষ-লক্ষ্মী হবে।

তা বটে।

আর একটুকুন লেবে নাকি ? পাল আবার বের করলে বোতলটা, আর গেলাসটা মুখে লাগানোই আছে।

দাও। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

মা লক্ষ্মী আবার এ গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরে বউ।

হুঁ। একটু ভেবে পাল বললে, তা বটে। তা—

যোগেন্দ্র বললে, বুঝে দেখ তুমি।

ধান কাটা হয়ে যাক তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে? দেখছ তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি ক'রে? লাও। নিজে খেয়ে পাল গেলাস বাড়িয়ে দিলে যোগেন্দ্রের দিকে।

তা বটে। যোগেন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিলে গেলাসটি। জোর অনুভব করছে সে; পাল মিছে বলে নাই, ভোরে একটু খেয়ে মাঠে বের হ'লে সেও পালের মত ধান কাটতে পারবে। গোটা মাঠখানা ধানে থইথই করছে। এ ধান নইলে তুলবে কি করে?

আর একটি মনের কথা বলি তোমাকে।

এ গেলাসটা খেয়ে যোগেন্দ্রর গায়ের জোর আর একটু বেড়েছে মনে হ'ল। সে গলাটা সশব্দে বেশ সবল জোয়ানের মত ঝেড়ে নিয়ে মদের স্বাদভরা থুথু মাটিতে ফেলে বললে, কি?

ওই চেকা!

যোগেন্দ্র তার মুখের দিকে তাকালে।

ওই চেকার ধান কেটে ঘরে তোলার আগে আমাকে কেটে ঘরে তুলতে হবে। আমাকে বাই ঠুকে যায় হে! ওঃ!

তা বটে।

দাঁড়াও না। সবারই সুসময় আছে। এই পঞ্চশ সাল থেকে ওর ভিরকুটি, টাকার গরম ধানের গরম এইবার ভাঙ্গবে। মা এসেছেন তুমি দেখো যগন্দ। এইবারেই, দেখো দেনা-তুনি শোধ করব আমি খাজনা দেনা এক পয়সা বাকি রাখব না। যা থাকবে, থাকবে তোমার অনেক—বিঘে ভুঁই চার বিশ তো ফলবেই কি বল?

তা খুব।

তা হলেই, আমি হিসেব করেছি, সব দিয়ে-থুয়ে পৌটি তিনেক থাকবে। তিন ভাগ করব—বুঝলে? তিনটি গোলা। একটি সরস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর, একটি আমার! এই আমার বরাবর চলবে। এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব। তুটো গোলা নির্দিষ্ট

রেখে দোব আমার কম্মের জন্যে। বাকি যা থাকবে, ওরা যা খুশি তাই করবে!

যোগেন্দ্র বললে, ভাল যুক্তি, ভাল যুক্তি? আমাকেও এমনই বন্দোবস্ত করতে হবে!

করতে হবে নয়, ক'রে ফেলাও।

কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে, ডেকো আমাকে! আর বোতলটা বরং নিয়ে এসো, এক ঢোক না খেয়ে তো যেতে পারব না মাঠে!

পাল বললে, আনব। তারপর হঠাৎ যেন তার কথাটা মনে পড়ল, বললে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি।

কি?

এর ওপর দুধ ভাল নয়। দুধ খাও তো বিকেলে খেও। এর পর ভাল হ'ল মাংস। তা ভাই, সে তো উপায় নাই। মাছটা বেশী খেও।

মাছ? যোগেন্দ্র হাসলে। পাব কোথা?

আঃ! জাল-টাল সব গিয়েছে হে। নইলে—। নইলে বাবুদের সায়র-পুকুরে সে কালের ফিষ্টির রাত্রের মত জাল ফেলে ধরা কিছু বিচিত্র ছিল না মুকুন্দের পক্ষে। শরীরে তার যথেষ্ট জোর আছে। ওই চেকার চেয়ে জোরে ঘুরিয়ে জাল সে ফেলতে পারে, এ কথা সে বাজি রেখে বলতে পারে। বাবুদের পুকুর কেন? জাল থাকলে আজ চেকার পুকুরেই ফেলত জাল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যোগেন্দ্র বললে, ভোরে ডেকো যেন।

॥ চার ॥

মাঠ-থইথই-করা ধান মুকুন্দ কেটে চলে জোয়ানের মত। হা-হা ক'রে হাসছে। যোগেন্দ্রও কাটছে। সেও যেন তাগদ অনেকটা ফিরে পেয়েছে। অন্য সকলেও কাটছে। মুকুন্দ-যোগেন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনীর নেশার জোর তাদের নাই, কিন্তু ধানের নেশা তাদের পেয়েছে।

মাঠে মাঠে থাকবন্দী ধান ছোট ছোট ঘরের মত আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মেলা ব'সে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে দূর থেকে! গাড়িতে গাড়িতে সেই ধান ক্রমে ক্রমে ঘরে নিয়ে চলেছে সব। মুকুন্দের কেলে সত্যিই সাবাস জোয়ান, মুকুন্দ এবার তার ওই নাম দিয়েছে। সমানে টেনে চলেছে জোয়ান বলদটার ডাইনে থেকে। মুকুন্দ গাড়িতে ধান বোঝাই করছিল। দুখানা জমির ওপারের খানার উপর দিয়েই পড়েছে জমি বরাবর গাড়ির রাস্তা। একখানা গাড়ি চলেছে, হৈ-হৈ ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোঠা-ঘরের মত ধান বোঝাই করেছে গাড়িতে। ধূলো উড়ছে। চেকার গাড়ি চলেছে। নইলে এমন গরু আর কার হবে! হ্যাঁ, চেকাই বটে। ওই যে গাড়িতে বোঝাই ধানের মাথায় ব'সে আছে, চালের মটকায় হনুমানের মত।

হৈ কত্তা!

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত টিপে ধ'রে তার দিকে চাইলে শুধু।

হবে নাকি? বাই ঠুকছে চেকা, হি-হি ক'রে হাসছে।

পাল একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুঁড়লে, অবশ্য অন্য দিকে ছুঁড়লে, ছুঁড়ে ব'লে উঠল, উ-লে-লে-লে! অর্থাৎ হনুমান তাড়াচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে হা-হা ক'রে হেসে উঠল। সেই হাসি। তারপর সে দুই হাতের মুঠোতে ধ'রে টেনে তুলতে লাগল ধানের আঁটি। এবারকার ধানে তার

আড়াই মুঠোয় বাঁধা আঁটি। আড়াই হাত তিন হাত লম্বা খড়। ধান তুলছিল আর হাসছিল।

যাঃ শালা! পাল হাতের আঁটিগুলা ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাঁপ ধ'রে গেছে হেসে! শালাঃ! শালা চেকা! শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণাপূজা করবে এবার। হিংসুটে বদমাশ। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আর টাকার গরমে ধরাকে শরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মীপূজোয় বারোয়ারী থেকে ভাসান-গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনই অন্নপূর্ণাপূজার ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারী। ওর একার লক্ষ্মীপূজো। দশও এবার লক্ষ্মীছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ-ভরা ধানে খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মণ ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর।

*　　　*　　　*

'এস পৌষ ব'স পৌষ জন্ম-জন্ম থাকো; গেরস্ত ভরিয়ে থাকো দুধে ভাতে রাখো।' এবার সেই দুধে ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ! এতদিন পৌষ এসে 'বাউনির বাঁধন' মানে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতে গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত যেন উবে গিয়েছে। আসছে বছরের খোরাকির জন্য আবার মহাজন ঠিক করতে হয়েছে। এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে যেতে হয়েছে মানুষকে। এবারে যা নমুনা, তাতে ওর দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ-থইথই-করা ধান খামার-ভর্ত্তি গোলা-ভর্ত্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম-জন্মই থাকবে, গেরস্থকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা-পাথর ভ'রে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান, মোল্যানীরাও হবে আবার দলমলে মেয়ে, তাদের এক ফুঁয়ে শাঁখ বেজে

উঠবে শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুনে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে খামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল কি পাতা কি কুটো কি ময়লা। পৌষ-সংক্রান্তির ভোররাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে ধূপ দিয়ে রঙ-করা চালগুঁড়ার আল্পনা এঁকে শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে, পৌষ পৌষ পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে ব'স—পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল, শয়ে শূন্যের অর্দ্ধেক হ'ল পঞ্চাশ—এটা হ'ল সর্ব্বনাশের বছর, হয়েছেও সর্ব্বনাশ, কাল যুদ্ধে নাকি লাখে লাখে মানুষ মরছে, তিরিশ টাকা মণ চাল, দশ-পনরো টাকা জোড়া কাপড়, নুন নাই, চিনি নাই, ওষুধ নাই, দেশ-ভাসানো বান, রোগ-মড়ক, সর্ব্বনাশের আর বাকি কি? কিন্তু অতি মন্দের পরেই নাকি ভাল আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মত এবার সেই ভালর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ-ভরা ধানে। পালের অকাট্য ধারণা তাই। ভাল বছর এইবার থেকে আরম্ভ হ'ল। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়! এই চৈত্র নাগাদ যুদ্ধ মিটে যাবে, রোগ এই বসন্তের বাতাস বইলেই দূর হবে। সুবাতাসের মুখে রোগ কতক্ষণ? সুসময় এলে, দুঃখ অভাব সব পালায়, আলো ফুটলে দুঃস্বপ্নের মত।

পাল আবার তুলতে আরম্ভ করলে ধানের আঁটি। হাঁপটা এইবার গিয়েছে। ধান-পান তুলে সে একবার যাবে পারুলের কবরেজের কাছে। চিকিৎসা করাবে। শরীরটাকে তাজা করতে হবে। বয়স অবশ্য হয়েছে, তবে ষাট বছর কি এমন বয়স? তার বাবার জ্যাঠা ষাট বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছিল; সেই স্ত্রীর তিন কন্যে হয়; শুধু তাই নয়, সে স্ত্রী যখন মরে তখনও বুড়া বেঁচে ছিল, তারপরও সে মাঠে যেত। বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না ক'রে সে মরতে পারবে না। তা হ'লে ওই চেকাই সর্ব্বনাশ ক'রে দেবে। সরস্বতীর উপর

নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়। হুসহুস ক'রে সে ধান তুলতে লাগল।

আবার হৈ-হৈ উঠছে। কার গাড়ী আসছে! কিন্তু গাড়ী কই? কোথায়? তবে? কি হ'ল? কার কি হ'ল? কান খাড়া করে পাল শুনলে, কোন্ দিক থেকে আসছে হৈ-হৈ শব্দটা। গ্রামের দিক থেকে মনে হচ্ছে। কার কি হ'ল? বুকটা তার ধড়াস ক'রে উঠল। সরস্বতীর ছেলেটা—? পাল দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করলে।

কে? কে হে? ওহে! একটা লোক গাঁয়েব ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর হাঁটনে চলেছে কোথায়।--কে হে?

আমি শশী।

গাঁয়ে গোল কিসের?

রমণকাকা—

কি, কি হ'ল?

রমণকাকা মাবা গেল। ধানের পালই বাঁধতে বাঁধতে, 'বুকে কি হ'ল' ব'লে; বাস্—। আমি চললাম কাকার জামাইকে ডাকতে।

রমণ পাল ম'রে গেল। মুকুন্দদের দলের লোক সে। একবয়সী। ভাল লোক, ভাল লোক—বন্ধু লোক। ভাসানের দলে সাজত নারদ মুনি। দিন রাত্রি হরি হরি ক'রেই সারা হ'ত রমণ। পালের চোখে জল রমণকে মনে ক'রে। কিন্তু এইটুকু জোরে হেটেই আবার হাঁপ ধরেছে। একটু মৃতসঞ্জীবনী হ'লে হ'ত। ভাল ওষুধ। বার বার—বার বার মুকুন্দ রমণকে বলেছিল, রমণ, ওষুধটা ভাল ওষুধ, খাও। নইলে পারবে না। রমণ বলেছিল, ছি! না। নারায়ণ নারায়ণ। আমার গোবিন্দ আছে। মূর্খ—মূর্খ! গোবিন্দ ওষুধ খেতে বারণ করেন না। আর যদিই করেন, তবে যাও ধর্ম্ম নিয়েই স্বর্গে যাও।

পাল ফিরল মাঠের দিকে। ধান প'ড়ে আছে, গরু বাঁধা আছে। আজ এ ক্ষেতের ধানটা তুলতেই হবে। শুধু তোলা নয়, আজ কতকটা ধান পিঠে কিছু ধানও বিক্রি করতে হবে। পৌষের আজ হ'ল

চব্বিশে। জমিদারের লাটবন্দী যাবে আটাশে। তার আগে খাজনা কিছুটা দিতেই হবে। সে না দেওয়াটা দারুণ অন্যায়। চিরকাল দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আয়োজন আছে। সরস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে, লক্ষ্মীরও কাপড় চাই, নিজেরও চাই, সরস্বতীর ছেলের একটা দোলাই চাই। পূজা থেকে কাপড় হয় নাই! সে আবার মাঠে এসে ধান বোঝাই করতে লাগল। হুসহুস ক'রে বোঝাই ক'রে চলল ধান। বাপ রে বাপ রে, ধান আর শেষই হবে না যেন! এ গাড়িতে আর ধরবে না। বোধ হয় এই বেশি হয়ে গেল। বোঝাই ধানের উপর বাঁশটা দিয়ে শণের রশি টেনে ক'ষে বাঁধতে বাঁধতে একবার ভাবলে পাল। বেশি হয়েছে কিছু! তা হোক পরক্ষণেই সে হাসলে। বেশি? হায় রে কলিকাল! সে আমলে হ'লে—হায়, হায়, হায়! সে কাল কি আর আছে? সে আমলে পালের একবার একটা বলদ হঠাৎ ম'রে গিয়েছিল, এমনই ভর্ত্তি ধান তোলার সময়। গরুর জন্য ধান তোলা বন্ধ ছিল না পালের। একদিকে গরু জুড়ে, আর একদিকে নিজে দুই হাতের খাঁজে জোয়াল ধ'রে বুক দিয়ে টেনে তুলেছিল ধান। আর আজ এ ধান কাটা না হ'লে চলবে না যে, বরং আরও চারটি হ'লে ভাল হ'ত। খাজনা, লক্ষ্মীর উয্যুগ, কাপড়। বাঁশটা ক'ষে পাল নিজের গাড়ির মুখটা একবার তুলে দেখলে। হুঁ, বেশি হয়েছে!—কি রে কেলে? পারবি না বেটা?

কেলে নিজের নামটা বেশ বুঝতে পারে। পালের দিকে চেয়ে সে ফোঁস করে উঠল। পাল হাসলে, হ্যাঁ পারবি। তোর জন্যে তো ভাবি না রে। ভাবনা—ওই মর্কট জোয়ানটার জন্যে। বেটা আমার জোয়ান! পারে কেবল শিং নাড়তে। নে, চল্ দেখি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আপন মনেই পাল গরু দুটোর সঙ্গে বকতে বকতে গাড়ি জুড়লে! ধানের গাদায় লুকানো ছিল সঞ্জীবনী বোতলটা। এক ঢোক খেয়ে শরীরটাকে চাড়া দিয়ে নিজের শক্তিটা অনুভব ক'রে নিয়ে, বললে, চল্ চল্ বেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

গাড়ির জোয়ালটা গরু তুটার কাঁধে চেপে বসেছে ; কেলের পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে, পিছনের পা তুটোর ঠেলা দিয়ে তীরের মত সোজা করতে চাইছে সে। ঘাড়টা টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠেছে। নড়েছে। সাবাস বেটা ! আচ্ছা ! জোয়ানটাও টানছে।—বলিহারি বলিহারি রে-বেটা ! বাপ রে—ধন রে—মানিক রে ! হ্যাঁয়—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়। গাড়ি চলেছে—গাড়ির উপর কোঠা-ঘরের মত বোঝাই করা ধান তুলছে—মা লক্ষ্মী হেলে তুলে চলেছেন তার ঘরে।

গাড়িটা থেমে গেল, শব্দ হ'ল একটা ঘ্যাচ ক'রে। একটা আলের কাটে চাকা আটকে গেল। বাঁ দিকে জোয়ান গরুটাকে তাড়া দিয়ে পাল বললে, শালা, ভাত খাবার যম তুমি ! সে ক'ষে দিলে এক পাঁচন-লাঠির বাড়ি। গরুটা টানলে। চাকাটা নরল। কিন্তু ওদিকের চাকাটা নরল না। কেলে টানছে ; মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে তার, কিন্তু চাকা নড়ছে না।

কোলে লে বেটা লে। হ্যাঁয়—হ্যাঁয়। কেলে !

চাকা নড়ছে না। কেলে পারছে না টেনে তুলতে।—কেলে ! কেলে ! পাল খেয়ে নিলে আর এক ঢোক। শরীরটাকে আর একবার চাড়া দিলে। তারপর চাকার কাঠ তুই হাতে ধ'রে বুক দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলে—দাঁতে দাঁতে ক'ষে টিপে। পাকা শাল-খুঁটির মত পালের সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল। উঠেছে, হাঁ, উঠেছে। বহুত আচ্ছা। উঠে গেছে গাড়িখানা। আবার চলেছে। পালের বুকে, হাতে, মুখেও লেগেছে চাকার ধূলা। শরীরটা যেন সেকালের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। হাঁ, ঠিক হ্যায়। সে জোয়ানই আছে। শুধু হাঁপ ধরেছে খানিকটা। বুকের ভিতরটা ধড় পড় করছে একটু বেশি। হাঁ একটু বেশি। পাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গাড়ির উপরে ধানের বোঝাই ঠিক আছে ! হেলছে তুলছে। উঃ ! বুকটা নিয়ে সোজা হওয়া যাচ্ছে না। এ কি ! এ কি হ'ল ? আঃ ! নাক দিয়ে কি গড়াচ্ছে গরম ! আঃ

বুকের ভিতরটা ! এক হাত বুকে দিয়ে, আর এক হাতে পাল নাকটা মুছলে। এ কি! এ যে রক্ত! এ কি! থরথর ক'রে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভিতর কেমন করছে! চারিদিক কেমন হ'য়ে আসছে! চাঁদনী রাতে বকের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা বসুমতী—! এ কি! তার এ কি হ'ল? সরস্বতী, তার ছেলে, লক্ষ্মী, মাঠ ভরা ধান, এ ফেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে সজোরে চেপে ধরলে। নইলে প'ড়ে যাবে সে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ছিড়ে এল মুঠা-ভর্ত্তি ধান। গাড়ি চ'লে গেল। পাল মাটিতে প'ড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত! বারকতক পা দু'টো ছুঁড়লে— নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধূলার উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত ক'রে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্ত্তে।

* * *

সংক্রান্তির শেষরাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ-আগলাতে উঠে সরস্বতী লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ-পূজোর ছড়া বললে! শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে ব'সে ছিল ঘরে চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—। সে হড়াম ক'রে খোলা জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

ইস্কাপন

'ইস্কাতন' আর্থাৎ 'ইস্কাপন' কোন মানুষের নাম হয় না। কিন্তু চকচকে কালো রঙ আর চাকা মত মুখের চঙ—এই দুটোর জন্যে ওর ইস্কাপন নামটা মনে হয় না যে অসঙ্গত। বরং 'ইস্কাতন' বলে ডাকলে ও যখন সামনে আসে তখন মনে হয়—বাঃ, চমৎকার মিলিয়ে নাম হয়েছে তো। যে নাম দিয়েছিল তার রসবোধের এবং সেই বোধ প্রকাশের শক্তির তারিফ করতে হয় মনে-মনে। কিন্তু সে রসিক জন যে কে—সে আজ কেউ বলতে পারেনা। ইস্কাপনের বয়সই হ'ল চল্লিশের ওপর। ছেলেবেলা থেকেই সে ইস্কাপন ; ওই এক এবং অদ্বিতীয় নামেই সে পৃথিবীতে পরিচিত। তার বন্ধুবান্ধবে বলে—'ইস্কাতন'। থানার স্থানীয় ইতিহাসের যে পাকাখাতা—তাতেও লেখা আছে "ইস্কাপন"। "পিতা অজ্ঞাত, জাতি অজ্ঞাত, নিবাস অজ্ঞাত। ভীষণ প্রকৃতির লোক। কথায় কথায় মারপিট করে ; দুর্দান্ত মাতাল ; বেশ্যাসক্ত ; চোর। স্থানীয় সাহোড়া 'গ্যাঙ্গ' এর gang (ডাকাতের দল) সঙ্গেও যোগাযোগ আছে বলিয়া সন্দেহ করা যায়। অন্তত এই গ্যাঙ্গ এখান হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী সদর থানার এলাকাভুক্ত তারাপুর গ্রামে যে ডাকাতি করিয়াছিল, সে ডাকাতিতে মোটরবাস ব্যবহারের যে অসমর্থিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে 'ইস্কাপন' যুক্ত ছিল। মোট বাসের ক্লীনার সে। লাইসেন্স না থাকিলেও ড্রাইভিং জানে। সন্দেহ হয় সেই মোটর বাস ড্রাইভিং করিয়াছিল।"

তেরশো পঞ্চাশ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস।

'ইস্কাপন' জেল থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় আট মাস পর। তেরশো উনপঞ্চাশের সপ্তমী পূজার দিন দুপুর বেলা থেকে যে

কাল ঝড় আরম্ভ হয়েছিল, সেই ঝড়ের রাত্রে 'ইস্কাপন' বেরিয়েছিল চুরি করতে। অবশ্য তখন কি কেউ বুঝেছিল যে ঝড় নয়, প্রলয়? বাদলা, আকাশ-জোড়া মেঘের অন্ধকার, রিমি ঝিমি বৃষ্টি, তার সঙ্গে বুনো শূয়োরের মত গোঁ-গোঁ ক'রে বাতাসের দমকা; চুরির পক্ষে এমন রাত্রি আর হয় না। তার ওপর পটলির মুখ ভার! দোকানে সে কি একটা শাড়ী দেখে এসেছিল—দাম তার কুড়ি টাকা। সেখানা নইলে তার মন উঠছিল না কিছুতেই। কাপড়খানা অবশ্য বাহারের কাপড়! যে জিনিষ 'ইস্কাপনে'র খুব ভাল লাগে সে জিনিষকে সে বলে 'মনমোহিনী'। কাপড়খানা মনমোহিনীই বটে। মদের নেশায় শরীরে মনে বেশ চনচনে ভাব এসেছিল। সে হঠাৎ উঠে গান ধরেছিল—"ও আমার ঘেঁটুনির মন হোল ভারী, নতুন কাপড় নইলে যাবেনা শ্বশুর বাড়ি!" 'আচ্ছা চললাম আমি। একটুকুন হাস দেখি!'

পটলিও ফিক ক'রে হেসে ফেলেছিল।

ইস্কাপন কাজ ঠিক সেরেছিল। দু ক্রোশ দূরের মনি চন্দের বাড়ি ঢুকে ঠিক হাত বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ধরা পড়বার কোন ভয় ছিলনা। কিন্তু তখন বুনোশূয়োর শেলেদো বাঘ হয়ে উঠেছে, ঝড় তখন মেতেছে, একা পবন তখন ঊনপঞ্চাশ ধারায় বইছে। জলের জোরও বেড়েছে, গায়ে লাগছে—যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সূচ এসে বিঁধছে। খানিকটা আসতেই হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত কনকনিয়ে উঠেছিল। একটু বিশ্রামের জন্যে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের তলায়। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ল একটা ডাল। সেটা ঘাড়ে পড়লে ইস্কাপন তুরুপ হয়ে যেত, মরেই যেত সে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, গোড়া চাপা না পড়ে পত্রপল্লসঙ্কুল ডগার দিকটার ঝাপটা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে পাতা চাপা পড়েছিল। আসলে মনি চন্দের কপালটাই পাতা চাপা আর ইস্কাপনের কপালটা যাকে বলে পাথর চাপা; তাই সকালেই

সেই দুর্যোগের মধ্যেও থানায় খবর দিতে যাবার পথেই মণি ফিরে পেলে তার বাক্স আর পাতা চাপা পড়ে বেঁচে ইস্কাপন পড়ল ধরা।

অতঃপর পুলিশের হেপাজতির মধ্যে জেল হাসপাতাল। সে প্রায় মাসখানেকের ওপর। তারপর বিচার! তারপর ছ মাস জেল।

জেল মন্দ জায়গা নয়, শরীর সারে, কিন্তু প্রথমেই ওই যে হাসপাতালে একমাস পড়েছিল তাতেই ইস্কাপনকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। তবুও সে মনে মনে ভাগ্যকে মানে যে, ভাগ্যে ওই হাসপাতালে এসে পড়েছিল সে, তা না হলে পট্‌লি হয় তো শাড়ী পড়ত, কিন্তু তাকে পটল তুলতে হ'ত অবধারিত। যাক্, সে ভাঙ্গা শরীর আর তার জোড়া লাগল না। কাঁধের হাড়গুলো উঁচু হয়ে উঠে পড়েছে, চাকা মুখের পুরন্ত গালও চড়িয়ে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে। জেলে গোপনে বহু কষ্টে সংগ্রহ করা ভাঙ্গা আয়নার টুকরোয় নিজের চেহারা দেখে সে আপন মনেই দুঃখের হাসি হেসে রসিকতা করে যা বলত তাই বললে সে গাঁয়ে পা দিয়েই। সে গাঁয়ে ঢুকছে, আর নোটন চৌকিদার বেরুচ্ছে। নোটনের পেছনে ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারীবাবু। নোটন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল—ইস্কাতন? আ—হা—হা, এ কি চেহারা হয়েছে রে?

ইস্কাপন হেসে বললে—ভেঙ্গে চিড়িতন করে দিয়েছে ভাই! তারপরে তোমাদের সব ভালতো? সেক্রেটারীবাবু ভাল আছেন?

সেক্রেটারী সংক্ষেপে জবাব দিয়ে এগিয়ে গেল। চৈত্রে বছর শেষ হয়েছে, বাকী ট্যাক্স অস্থাবর ক'রে আদায়ের পালা; মেজাজটা তার রুক্ষ হয়েই আছে। তার ওপর কোথা থেকে এল বেটা চোর, বেটার মুখ দেখে যাত্রার ফলে যে কি আছে কপালে কে জানে! আবার ওর ট্যাক্স আদায়েরও হাঙ্গামা বাড়ল। জেলে ছিল, পড়েছিল ভাঙ্গা ফুটো ঘরখানা, স্বচ্ছন্দে রেহাই পড়তো বেটার ট্যাক্স অনুপস্থিতির অজুহাতে। বেটা এল ঠিক সময়টিতে; এইবার যেতে হবে ওর দরজা ছাড়াতে। তার ওপর চোর ফিরল—হাঙ্গামা বাড়ল।

নোটন পিছিয়েই ছিল ইচ্ছে করে। সেক্রেটারী ডাকলে—আয়রে নোটনা!

—এই যাই আজ্ঞে। যেতে যেতেই সে অকৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে মৃদু স্বরে বললে—পট্‌লি মরে গিয়েছে রে!

—মরে গিয়েছে?

—হ্যাঁ—বড় কষ্ট পেয়ে—

সেক্রেটারী ডাকলে—নোটনা!

—এই যে আজ্ঞে। ঘা হয়েছিল, দূষি ঘা।

—নোটনা!

নোটন আর দাঁড়াতে পারলে না। ছুটে যেতে হল তাকে। ইস্কাপন দাঁড়িয়েই রইল। পট্‌লি মরে গিয়েছে! সর্ব্বাঙ্গে ঘা হ'য়ে—দূষিত ঘা হয়ে মরে গিয়েছে? হঠাৎ তার কানে এল সেক্রেটারী নোটনকে বলছে—ও বেটাও জেলে মলে যে ভাল হ'ত!

অন্য সময় হলে ইস্কাপন গর্জন করে উঠত। কিন্তু আজ তার মুখে কোন কথা ফুটলনা। পট্‌লির মৃত্যুর দুঃখের ওপরেও সে আরও দুঃখ পেলে। সে মরে গেলে ভাল হ'ত?

ইস্কাপনের যেন কিছুক্ষণের জন্য হুঁস রইলনা। গ্রামে ঢুকতেই এমন দুঃসংবাদ আর এই দুঃখ পেয়ে মন তার কেমন হয়ে গেল। পট্‌লি মরে গিয়েছে? তবে? কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে? এতক্ষণ সে কেবল পট্‌লির কথাই ভাবতে ভাবতে আস্‌ছে। নানা রকম ভাবনা। জেল থেকে বেরিয়েই মনে হয়েছিল তার—"পট্‌লি তার জন্যে ভেবে, তার অভাবে না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে; যে ক'খানা সোনা, রূপোর টুকরো তার গায়ে ছিল তার আর কিছুই নাই; পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়; মুখে হাসি নাই; তার চোখের তারা দুটি আগে সেই যে নাচুনে কাল ফড়িংয়ের মত নাচত—তা আর নাচেনা, তার বদলে চোখের তারা দুটো হয়ে গেছে মরা ফড়িংয়ের মত। ইস্কাপনকে দেখে সে ঝর ঝর ক'রে কাঁদবে।"

কিছুক্ষণ পর নিজেই সে হেসে আপন মনে বলেছিল—"হুঁ !" বার বার ঘাড় নেড়েছিল অস্বীকারের ভঙ্গিতে।—"পটলি তো ! সেই পট্‌লি ! যে পথ চলে হেলে দুলে, যেন নেচে চলে ; সে কথা কয় পিচ কেটে, মানুষের মনকে কেটে যেন খান খান করে দেয় ; হাসতে গিয়ে সে ভেঙ্গে পড়ে অতি বাড়ন্ত-লতার মত ; ভাল ছাড়া মুখে যার কিছু রোচে না ; পছন্দ না হ'লে, যত আদর ক'রে দেওয়া হোকনা, সোণার জিনিসও সে পায়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়—সেই পট্‌লি ! সে নাকি তার জন্যে বসে আছে ! সে আবার কারও সঙ্গে জুটে গিয়েছে। জুটবার লোকের তো অভাব নাই। তার বাড়ির পাশে বাবুভাই থেকে আরম্ভ ক'রে কতজনই না ঘুর ঘুর করত ! কেবল তার অস্ত্র সেই মোটরের ষ্টার্টার লোহার ডাণ্ডাটার ভয়েই ঘুর ঘুর ক'রেও কেউ কিছু করতে পারেনি।"

চোখ দুটো তার জ্বলে উঠেছিল।

"ফের- ফিন—ওই ডাণ্ডা ধরবে সে। কুছপরোয়া নাই। আর যার কাছেই থাক না পট্‌লি একটি পাঁচ খাঁটি খেয়ে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে সে গিয়ে হাজির হবে। যে মরদই হোক ভাগে ভাল, না হলে মারবে ডাণ্ডা। পটলির চুলের মুঠি ধরে --।" সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গিয়েছিল - গাঁয়ের বাউলদের কাছে শোনা একখানা গান--"কেশে ধরে দিয়ে যাবে মিনতি কাহিনী শুনবে না !"

"সেই পটলি মরে গিয়েছে ? দূষি ঘা হয়ে মরে গিয়েছে ?" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। "দূষি ঘায়ের আশ্চর্যি কি ? সে ছিল না, পেটের দায়ে পাপ করেছিল। না করেই বা খেত কি করে সে ?"

জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ চনচনে হয়ে উঠেছে। চারি পাশের মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। আকাশ থেকে মাটী পর্য্যন্ত সব ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। বোশেখ মাস থেকে জল নাই, মাঠে বীজ ধান পড়ে নাই। ইস্কাপনের শরীর জ্বলে যাচ্ছে যেন। চটচটে ঘামে

সর্বাঙ্গ চটচটে হয়ে উঠেছে। সে আবার পা বাড়ালে গাঁয়ের দিকে।

"থাক্‌গে। পট্‌লি মরেছে, কথা দুঃখেরই বটে—কিন্তু কি করবে সে? সেই যদি সেই রাত্রে গাছ চাপা পড়ে মরত! কি হ'ত? পটলি তা হ'লে তো সঙ্গে সঙ্গেই সাঙা করত! পটলি গিয়েছে, ঝিঙে আছে, উচ্ছে আছে, আবার কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবে সে। বাঁচতে যখন হবে—তখন আর কি করবে? খেতেও হবে, ঘরও বাঁধতে হবে, সবই করতে হবে। এবার সে মোটর চালানোর লাইসেন্স নেবে। হয়তো দেবে না পুলিশ সাহেব। না দেয় তাতেই বা কি? ক্ষিতীশের মোটর ট্যাক্সীতে তো বাঁধা চাকরী তার। গাঁ থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ তাকে ষ্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে পাশে বসে ঘুমোবে, সে ছাড়বে গাড়ী।"

"গোঁ—গোঁ ক'রে ছুটবে গাড়ী। পায়ের রোঁয়া গুলো ঝলসে, জলের অভাবে মরা বীজ ধানের চারার মত শুকিয়ে খসে যাবে। রেডিয়েটারের ভেতর জল ফুটবে টগবগ ক'রে। পিছনে উড়বে ধূলো, পাশের গাছপালা ছুটবে উল্টো বা'গে, পাশের দূরের গাঁগুলো ঘুরবে আস্তে আস্তে পাক দিয়ে।"

এই কল্পনার ফলেই অকস্মাৎ একটা সজীবতার প্রবাহ বয়ে গেল ইস্কাপনের সমস্ত শরীরে, মনেও বয়ে গেল। তার চলার গতি দ্রুত হল আপনা থেকেই। কয়েক পা গিয়েই কিন্তু সে থমকে দাড়াল; পিছন ফিরে চাইলে—যে পথে চলে গেছে সেক্রেটারী আর নোটন, সেই দিকে। তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। তবুও তার চোখ দুটো যেন দপ্‌দপ ক'রে জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে বললে—শালা!

বললে ওই সেক্রেটারীকে। বলবে না? কি দোষ তার, ইস্কাপন সেক্রেটারীর কি ক্ষতি করেছে যে এত বড় কথাটা সে বললে? জেলের মধ্যে সে মরে গেলেই ভাল হ'ত? কই সেক্রেটারীকে

দেখে তার তো মনে হয় নাই—এই আট মাসের মধ্যে সেক্রেটারী মরে গেলে ভাল হত!

ইস্কাপনের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল।

* * *

ঘরখানা শুধু নামেই দাঁড়িয়ে আছে।

চালে এক মুঠো খড় নাই। বাখারীগুলোর অর্ধেক আছে অর্ধেক নাই। দেওয়ালের একটা দিক গোটাই পুড়ে গিয়েছে! বাকী তিন দিকেরও ছ আনা অবস্থা। দশ আনা আছে। দরজাটা ভেঙ্গে পড়ে আছে দাওয়ার ওপর; মাটী চাপা পড়ে আছে। ইস্কাপন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল! এমন বেশী মাটী কিছু চাপা পড়ে নাই, তব দরজা জোড়াটা থাকল কি ক'রে? হঠাৎ তার হাসি পেল। দরজাটাকে চাপা দিয়েছে যে মাটিটা—সেই মাটির ঢিপিতে একটা গর্ত, গর্তের মুখে একটা গোখরা সাপের খোলস। হরি হরি, ওই জন্য! সাপটাকে দেখতে না পেলেও সাপটাকে তার ভাল লাগল। ভাল সাপ! সাপটাকে সে মারবে না। তাড়িয়ে দিলেই হোল। ঘর দোর পরিষ্কার করে থাকতে আরম্ভ করলেই ও পালাবে। আর দরজার মাটি খুঁড়তে গেলেই যদি বেরিয়ে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যাবে। হঠাৎ মনে হল, কালীমায়ের ডোম দেবাংশী যেমন একটা গোখারা পুষেছে তেমনি করে সাপটাকে ধরিয়ে ওর বিষ দাঁত ভেঙে ওটাকে পুষলে কেমন হয়?

—এই ইস্কাপন?

—কে? ইস্কাপন ঘুরে দেখলে—তার জমিদারের লোক। জমিদার মানে—এই খানিকটা জমিরই মালিক শুধু। গেরস্ত ভদ্রলোক। তারই গরুর রাখালটা এসে দাঁড়িয়েছে। ইস্কাপন বললে -কি?

—বাবু বললে, তোমার ঘর বাবু অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে। এ ঘরে তুমি ঢুকো না।

—দিয়ে দিয়েছে? অন্য লোককে? ঢুকব না ঘরে আমি?

—হ্যাঁ! তাই বলে দিল বাবু।

ইস্কাপন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ রাখালটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল—শালা! শূয়ারের বাচ্চা! কি বললি? আমার বাড়ি—আমি ঢুকব না?

লোকটা পিছু হঠতে সুরু করলে—ওই তা আমি কি করব? বাবু বলে দিলে যে তোমাকে বলতে।

—বাবু? ওরে শালা তুই এলি কেনে? তোমার বাবুকে মেরে তবে আমার অন্য কাজ! আমার ঘর, শূয়ারের বাচ্চা! ছোট লোকের কুত্তা—

লোকটা ততক্ষণে পিছন ফিরে বোঁ বোঁ শব্দে ছুটতে আরম্ভ করেছে। আগেকার কাল হলে এই দৃশ্য দেখে ইস্কাপন হো-হো ক'রে হাসত। কিন্তু আজ আর তার হাসি এলনা। রাগে মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। সে ছিল জেলে বন্দী হয়ে, তার এই অসময়ে তার ঘর, কত যত্ন ক'রে সে ঘরখানি করেছিল, সেই ঘর তার অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে! ইস্কাপন কুড়িয়ে নিলে একটা মাটির ঢেলা। ছুড়লে বোঁ করে পলায়নপর রাখালটার দিকে! কিন্তু রাখালটার ভাগ্য ভাল। লাগল না তাকে। কিছুক্ষণ রাগে গুম হয়ে সে সেইখানে বসে রইল। তারপর উঠে চলল ক্ষিতীশের সন্ধানে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষিদে পেয়েছে। রৌদ্রের মধ্যে যেন আগুনের আঁচ খেলে যাচ্ছে।

ইস্কাপনের মনে হ'ল এসব যেন হচ্ছে একা তার ওপর অত্যাচার করবার জন্য। এ রৌদ্রের এই আগুনের ঝলক—এও তাকে দগ্ধাবার জন্যে।

সেক্রেটারী তাকে বিনা কারণে বলে—লোকটা মরে নি কেন?

জমিদার তার বাড়ি কেড়ে নিয়েছে।

গাঁয়ের মাটি তার পায়ের তলায় তেতে জলন্ত আঙার হয়ে উঠেছে। বাতাসে আগুনের আঁচ এসে তাকে দগ্ধাচ্ছে।

ক্ষিতীশের বাড়ি বন্ধ। মোটরের গ্যারেজটা ফাঁকা।

ক্ষিতীশ নাই। যুদ্ধের জন্য পেট্রোল পাওয়া যায় না। ট্যাক্সি চালানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি বিক্রী ক'রে ক্ষিতীশ চলে গিয়েছে এখান থেকে। ইস্কাপন বসে পড়ল। তার চোখের সামনে সত্যিই পৃথিবী খাঁ—খাঁ করছে। আকাশ থেকে মাটি পর্য্যন্ত ধোয়া —সব ধোয়া।

আপনার কাছার খুঁটে কয়েকটা টাকা ছিল—সেইটাতে সে হাত দিয়ে দেখলে। জেল গেটে জামা ছিল টাকা ক'টা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে উঠল। বাজারে এসে কেষ্ট মোদকের দোকানে দাঁড়াল।

—ভাল আছেন, মোদক মশায় ?

—কে ? ইস্কাতন লাগছে !

—হ্যাঁ গো !

—এলি কবে ?

—আজই।

—বেশ! বেশ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কেষ্ট মোদক বললে,—তারপর ?

—এই চিঁড়ে—আর মিষ্টি দ্যান দেখি !

—ধারে দিতে পারব না কিন্তু।

কাছার খুঁট খুলে একটা টাকা বার ক'রে ইস্কাপন আগেই ফেলে দিলে—বললে—দু'আনার চিঁড়ে—দু আনার মিষ্টি !

—এ কি ? এই দু আনার চিঁড়ে ? দু আনার ওই ক'টি কি দিচ্ছেন ?

মোদক হেসে বললে—এই দু আনার চিঁড়ে।

ইস্কাপনের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। দু আনার চিঁড়ে ? গলায় ছুরি দ্যান না কেনে তার চেয়ে।

মোদক দু আনার দুটি বড় মার্বেলের মত রসগোল্লা ঠোঙায় ফেলে

দিয়ে বললে—ধানের দর পনের টাকা ! চালের পঁচিশ টাকা। এক পয়সার মিষ্টির দাম চার পয়সা হয়েছে। এই দেখ।

ইস্কাপনের আর সহ্য হল না। সে ঠোঙাশুদ্ধ চিঁড়ে সন্দেশ ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে বললে—তার চেয়ে এক টাকার আফিং খেয়ে মরব।

ঘটনাটা হাস্যকর, তবুও কেষ্ট মোদক অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে—আমরা কি করব বল ?

তোমরা কি করবে সে ইস্কাপন জানেনা। সে জানে এ অত্যাচার। তার পট্‌লি মরেছে ; ঘর কেড়ে নিয়েছে জমিদার, ট্যাক্সি বন্ধ হয়েছে, ইস্কাপনের কাজ গিয়েছে। চার আনার খাবারে পেটের একটা কোনও ভরবে না ইস্কাপনের—এ অত্যাচার। তার ইচ্ছে হচ্ছে—মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে। কেষ্ট ময়রার মাথাটা ভেঙে দেয়—দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে।

—আরে, ইস্কাপনোয়া ! থানার কনেষ্টবল।

রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে।—সাধারণ চোর ডাকাতের মত সে থানা পুলিশকে ভয় করে না।

—চল্—দরোগা বাবু বোলাইছেন তুকে।

—এখন আমি যেতে লারব, যাও। বলে সে হন হন করে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই সে ফিরল।—চল—তোমার দরোগাই কি বলছে দেখি। চল।

দারোগা বললে—কবে ফিরলি ?

—আজই।

—কোথায় উঠেছিস ?

—ঘর ভেঙে গিয়েছে। পট্‌লি মরে গিয়েছে। ক্ষিতীশ নাই। পথেই ঘুরছি এখন।

—তারপর ?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইস্কাপন বললে—ক্ষিদেতে পেট জ্বলে গেল, খেতে হ্যান মশায়। দারোগা অবাক হয়ে গেল।

ইস্কাপন বললে—চার আনার চিঁড়ে মিষ্টি কিনে রেগে ফেলে দিলাম। এই—এই এক মুঠো চিঁড়ে—আর এই টুকুন ছুটো মিষ্টি—চোখে তার জল এল।

দারোগা চারটি মুড়ি আর এক টুকরো পাটালী তাকে দিলে। বললে—বিকেলে বরং লঙ্গরখানায় যাস, সেখানে খেতে পাবি।

লঙ্গরখানা? ইস্কাপন অবাক হয়ে গেল।

দারোগা বললে—কোথায় থাকবি, কি করবি খবর দিয়ে যাস বাপু। তারপর বললে—তুই শহরে-টহরে চলে যা না রে। মোটরের কাজ জানিস। চাকরী যা হোক মিলবেই। এখানে থাকলেই তো হাঙ্গামা করবি। আর অভ্যেসে না করলেও পেটের জ্বালাতেও চুরি করতে বাধ্য হবি।

লঙ্গরখানা।

দেখে শুনে ইস্কাপন অবাক হয়ে গেল। সারি সারি বসে গেছে সব—মেয়ে-পুরুষ ছেলেবুড়ো জোয়ান, যাকে আগে এখানে বলত কাঙালী ভোজন—লঙ্গরখানা তাই। তবু তার সঙ্গে অনেক তফাৎ। কেউ কারু দিকে তাকায় না। জোয়ান ছেলে পর্য্যন্ত জোয়ান মেয়ের দিকে চাইতে ভুলে গিয়েছে। পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গিয়েছে, চোয়ালের হাড় উঠেছে উঁচু হয়ে, পেট জ্বলে গিয়েছে। জোয়ান ছেলে—যে চোখের রঙের ঘোরে যুবতী মেয়ের দিকে তাকায়—সে রঙই মুছে গিয়েছে চোখ থেকে। ঘোলা হলদে চোখ। ইস্কাপনের নিজেরই চাইতে মনে থাকল না।

তু-হাতা চালে ডালে ঘাঁটা জলো খিচুড়ী। জেলের লপ্সী এর চেয়ে ঢের ভাল। খানিকটা শাকপাতায় আর একটা কিম্ভূৎকিমাকার বস্তু। তবু পেটের জ্বালায় তাই খেয়ে সে উঠে পড়ল। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। হাজার বার ভাল। তার হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত জ্বলছে যেন। মরে হাড় জুড়োয়—কথাটা সে শুনেছিল—আজ সে খুব ভাল ক'রে বুঝতে পারলে কথাটা।

ইস্কাপন কাকা !

কে ?

তিনটে ছেলে। একটার বয়স আট—একটার পাঁচ—একটার তিন কি চার। অদূরে দাঁড়িয়ে একটা বছর পনেরো বয়সের মেয়ে। মোটা ডিগডিগে পেট—বুকের পাঁচরাগুলো জির জির করছে; ঘোলা চোখ, রুক্ষ চুল। চৈতন হাড়ির ছেলে সব। ওই মেয়েটা চৈতন্যের বেটার বউ। চৈতন হাড়িকে ইস্কাপন দাদা বলত। চৈতনও চোর ছিল—দুজনের মধ্যে ভালবাসাও ছিল খুব। দুক্রোশ দূরে চৈতনের বাড়ি।

—কি রে ? তোরা হেথা কেনে রে ?

—খেতে আইচি। তুমি কবে এলে কাকা ?

—খেতে এসেছিস ? এইখানে ? এই পিণ্ডি ? ইস্কাপন অবাক হয়ে গেল। চৈতন নামজাদা চোর। তা ছাড়া ইদানীং তো তার ঘরেই দল বেঁধে উঠেছিল। চৈতনের ছয় ছেলে! বড়টা মেঝটা ডাগর; বড়টার বউ ওই মেয়েটা। দুই ছেলে নিয়ে চৈতন রাত্রে বের হত।

—বাবা মরে গেইছে, কাকা।

—চৈতনদা মরেছে ?

—মা মরেছে, দাদা মরেছে. মধ্যম মরেছে. গোঁসাই চলে গিয়েছে কোথা !

হায় ভগবান ! বলছে কি ? স্মরবীর চৈতন. তার ছেলে—। কিসে মল ? কবে মল ? এবার বউটা এগিয়ে এল। বউটার চেহারাও যেন একখানা কাঁটার মত ! দেখে শরীর শিউরে ওঠে। অথচ চমৎকার দেখতে ছিল বউটা। হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটা এক হাত ঘোমটা টেনে ঘুর ঘুর করে বেড়াত, ভারী ভাল লাগত। ঘোমটার মধ্য দিয়ে চোখে চোখ পড়লেই ফিক্ ফিক্ করে হাসত।

চৈতনের স্ত্রী পুত্রবধূকে এর জন্যে গাল দিত,—মব মুখপুড়ী,

কালামুখী দেখনহাসি আমার দোব নোড়ায় ঠুকে দাঁত ভেঙে।

চৈতনের ছেলে গর্জাতো নেকড়ে বাঘের মত, বলতো—টুটি ছিঁড়ে দেব একদিন !

চৈতন বলতো—উ কি বদ স্বভাব ?

চৈতনের ছেলে ইস্কাপনকে কাকা বলতো, তবুও ইস্কাপনের মনে হত—। আজ কিন্তু ইস্কাপনের সমস্ত ভেতরটা ঘিন ঘিন করে উঠল ওকে দেখে। মেয়েটাব মুখে আর সে ঘোমটাও নেই, সে হাসিও নেই। সে বললে—গুষ্টিশুদ্ধ কলেরা হয়েছিল। আমরা বাঁচলাম তারা মরে গিয়েছে। সেজন্য পালিয়েছে।

বড় ছেলেটা বললে—এইখানে খাই আমরা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ইস্কাপন মোদকের দোকানে টাকা ভাঙ্গানী পয়সা থেকে আধুলিটা বের ক'রে ছেলেটার হাতে দিয়ে বললে—বাড়ী যা ! বলেই সে চলতে আরম্ভ করলে।

কিছুদূর এসে হঠাৎ তার মনে হল পিছনে ছেলেগুলো এখনও কথা বলছে ! পিছন ফিরে দেখলে—সত্যই তাই ! সে দাঁড়াল !

—তোরা বাড়ী গেলি না ?

তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। বউটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—সন্ধ্যে হয়ে গেল যে ?

বড় ছেলেটা বললে—যাবনা বাড়ী।

মেজটা বলে উঠল—তুমি আইচ, এইবার তোমাব কাছেই থাকব কাকা !

ইস্কাপনের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল ! তার নিজের আশ্রয় নাই, কাজ নাই, তার দিন কাটছে ওই ভিক্ষের পিণ্ডি খেয়ে ; তার ওপর—রোয়া ওঠা কুকুরের বাচ্চার মত তিন তিনটে ছেলে, ওই কদর্য কুৎসিৎ একটা মেয়ে তার সঙ্গে জুটতে চায়। নিজেরই ওপর তার রাগ হয়ে

গেল। সে ঐ আধুলিটা দিয়েই নিজের সর্বনাশ করেছে। ওরা ভেবেছে, ওদের ওপর তার অনেক মায়া ; ওরা ভেবেছে—ইস্কাপনের অনেক পয়সা।

সে বলে উঠল, আমার বাড়ির ধার মাড়াবে তো খুন করবো তোমাদিকে। অত্যন্ত অশ্লীল গাল দিলে ওই কঙ্কালসার বউটাকে।—বেরো—বেরো—বেরো।

অনেকক্ষণ ঘুরে কোথায় রাত্রে শুয়ে থাকবে স্থির করতে পারলেনা। ষ্টেশনে গিয়েছিল। গরমের দিন। প্লাটফরম বেশ আরামের জায়গা, সেখানেও ভাল লাগেনি। অবশেষে সে এল আপনার ভাঙ্গা ঘরের সামনে। বাড়ী আর তার নয়, জমিদার কেড়ে নিয়েছে। মারামারি সে করতে পারে। কিন্তু কি ফল? এই গাঁয়ে—শুধু এই গাঁয়ে কেন—সব জায়গাতেই তো এই হাল! ইষ্টিশানে সে শুনেছে—দুনিয়া পৃথিবী শুদ্ধ এই অবস্থা। তবে তার কাছে এই গ্রামটিকেই সব চেয়ে নিষ্ঠুর স্থান বলে মনে হচ্ছে। তাই আর ঘর নিয়ে হাঙ্গামা করতে তার ইচ্ছে নেই। আজ রাতটা সে শুয়ে থাকবে তার ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায়। বেশ রাত্রি। তাতে গর্তের মধ্যে আছে যে গোখরোটা—সেটা যদি চুমু খায় তো খালাস! বাঁচে তো কাল সকালে উঠেই চলে যাবে।

সব অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরছে ফিরছে সে, অন্ধকারের মধ্যেও নজর চলছে বেশ। দাওয়ার কাছে এসেই সে চমকে উঠল। কে? কারা? হুঁ। তাই বটে! সেই নেড়ীকুত্তার বাচ্চার দল। আর সেই মেয়েটা! ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে সে ফস্ করে একটা কাঠি জেলে ফেললে।

ঠিক তাই। সঙ্গ ছাড়েনি। তাকে ছাড়বে না বলে এখানে এসে এক পাশে শুয়ে আছে। রূঢ় ঝাঁকি দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে সে ডাকলে। কিন্তু অদ্ভূত ঘুম। মরনদশা ওদের, আধা মরন ওদের হয়েই গিয়েছে। তাই ঘুমও ওদের মরন ঘুম। না হয়েই গিয়েছে এর মধ্যে?

গোখরো কাজ শেষ করেছে ? না ! গা গরম ; জ্বরের মত জ্বলছে। সে আবার ঠেলা দিলে—এই ! এই !

এবার তারা উঠল। ইস্কাপন একে একে হাত ধরে ঝুলিয়ে এনে রাস্তায় একরকম আছড়ে ফেলে দিলে। বউটাকে টেনে আনলে চুল ধরে। তার অঙ্গ স্পর্শ করতেও ইস্কাপনের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সকলকে টেনে বাইরে এনে রূঢ় স্বরে সে বললে—মরবি ! মরবি। গোখরো খরিশ দেবে শেষ ক'রে। ব'লে সে অন্ধকারের মধ্যেই সেই খোলসের টুকরোটা এনে তাদের গায়ে ফেলে দিয়ে বললে—এই দেখ।

তারপর সে সেখান থেকে এক রকম ছুটে চলে গেল। দশটার ট্রেণের টিকিটের ঘণ্টা বাজছে। সে ষ্টেশনের পথে উঠল এসে থানায়। আপিসে এখনও লণ্ঠন জ্বলছে।

—দারোগাবাবু !

—কে ? ইস্কাপন ? কি রে এত রাত্রে ?

—যাবার সময় বলে যেতে বলেছিলেন। তাই—

আশ্চর্য্য হয়ে গেল দারোগা।—কোথায় যাবি এত রাত্রে ?

—আজ্ঞে ? সে জানিনা কোথায়।

—যাবি কোথায় ? কাশী না গয়া—না মক্কা না মদিনা ? কোথায় ?

—কাশী। আজ্ঞে কাশীই যাব আমি।

—কাশী ?

—হ্যাঁ আজ্ঞে, সন্নেসী হব আমি। মেগে খাব। চুরি না—চামারি না। কাজ না কম্ম না—বাবার নাম করব আর মেগে খাব। আমি কাশী চল্লাম। দশটার ট্রেণে।

দরদর করে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

দারোগা অবাক গেল।

কাশী নয় ; বর্দ্ধমানে এসে হঠাৎ তার বৈরাগ্য কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিশ্বনাথের প্রতি ভক্তি সে আর অনুভব করলে না।

ভাগ! কাশী কেন যাবে সে? বাবা বিশ্বনাথ! মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ। একবার ইস্কাপন দেওঘর গিয়েছিল ক্ষিতীশের মোটরের সঙ্গে। বাপ্! মন্দিরের ভিতর যে অন্ধকার আর যে গুমোট গরম! ইস্কাপনের মাথাব উপরেই একজনের গঙ্গাজলের ভাঁড় ভেঙে গিয়েছিল।

সে কলকাতার গাড়ীতে চড়ে বসল।

কলকাতা! রাস্তায় পয়সা ছড়ান। বড় বড় মোটর বাস, ঝকঝকে দামী মোটব, বড় বড় ঘোড়া, আকাশ ছোঁয়া বাড়ী; বিজলী বাতি—রাত্রিতে অন্ধকার ঢুকতে পায় না কলকাতায়। রূপেব হাট কলকাতা। বেনাবসী শাড়ী পরে স্বর্গে পবীব মত মেয়েরা পথ আলো করে চলে যায়। দু'হাতে রোজকার করবে ইস্কাপন, পেট ভবে খাবে; সাধ মিটিয়ে পববে; চোখ জুড়িয়ে রূপ দেখবে, ঐশ্বর্য্য দেখবে, জীবন সার্থক করবে।

কলকাতায় এসে নামল সে। রাত্রি তখন দশটা। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার কলকাতা। অন্ধকাব! অন্ধকাব! সব অন্ধকার! অন্ধকার এত গাঢ় হয়? অমাবস্যাব রাত্রেব অন্ধকারে ইস্কাপন একা পথ হেঁটেছে -- কিন্তু এমন অন্ধকাব দেখে নাই। শুধু বড় বড় রাস্তায় দুপাশের দোকানের মধ্যে আলো দেখা যায়, তাব কিছু ছটা এসে পড়ে পথের উপর। কিন্তু বাস্তা—গলি পথ—সে কি ভীষণ অন্ধকার! মধ্যে মধ্যে ঠুঙি পবানো আলোর তলায় খানিকটা আলো যুগ-যুগ করছে।

পরদিন সকালে সে দেখলে—রাস্তাব ধাবে কঙ্কালসার মানুষের যেন মেলা বসে গিয়েছে। ওই গৌর দাদার ছেলেগুলোব মত বউটার মত হাড়-পাঁজরা সার ভিখিরীব পঙ্গপাল!

একটা জায়গায় ভিড় জমে গিয়েছে। চীৎকার করে কাঁদছে একটা মেয়ে। উঁকি মেরে ইস্কাপন দেখলে—একটা ছেলে পড়ে আছে, রক্তে ভাসছে যেন, মাথার খুলিটাব আধখানা নাই। রক্তের মাঝখানে

ভাসছে মাথার সাদা ঘিলু! মোটর চাপা পড়েছে। মা কাঁদছে বুক চাপড়ে। ওই ভিখিরীদেরই ছেলে!

শিউরে উঠে ইস্কাপন চলে গেল সেখান থেকে। রাগও হল। ড্রাইভার বেটাকে পেলে সে লাগাত কয়েকটা স্থইট ব্লো! ঘুসিকে ইস্কাপন স্থইট ব্লো বলে। কথাটা সে শিখেছে দেশের মোটর সার্ভিসের মালিকের কাছ থেকে। মালিক স্থযোগ পেলেই স্থইট ব্লো চালাত তাদের বুকে পিঠে।

বাস মোটর ট্রাম দেখতে দেখতে সে চলে।

আবার এক জায়গায় সে দাঁড়ায়। অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। একখানা মোটর বাসে ছুটো ভিখিরীকে ধরাধরি করে তুলছে। মরেই গিয়েছে বলে মনে হ'ল ইস্কাপনের। না, বুকের পাঁজরাগুলো ছুলছে এখনও। মোটর বাসটার পিছন দিকটা কাটা, গায়ে একটা লাল ঢেরা কাটা আঁকা রয়েছে। কে একজন বললে—হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।

—হাসপাতাল না মাথা। নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে নিমতলায়। যমের বাড়ী।

তিন জন ভিখিরী কাঁদছে—ওগো নিয়ে যেয়ো না গো! তোমাদের পায়ে পড়ি গো!

নীল কোর্ত্তা পরা একটা লোক গাড়ীতে হ্যাণ্ডেল মারলে।

ষ্টার্ট নিলে না গাড়ী। বোঁ বোঁ করে হ্যাণ্ডেল মেরে লোকটা ঘেমে গেল। ড্রাইভার এবার সেলফ্ স্টার্টারের চাবী টিপলে। খানিকটা—কো—ওঁ—ওঁ করে সেও থেমে গেল। ড্রাইভার ইঞ্জিনের বনেট খুলে ফেললে।

ইস্কাপনও কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে কি হ'ল ইঞ্জিনটার। অত্যন্ত ছোট্ট একটা ব্যাপার। ইস্কাপনের চোখে পড়ে গেল ব্যাপারটা। ড্রাইভার খুঁজে বেড়াচ্ছে বাঁশ বনে কানা ডোমের মত। ইস্কাপন আর থাকতে পারলে না। বললে—ছেলের কানে বেথা, আপনি পেটের চিকিৎসে করছেন যে মশায়!

বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে ফিরে চাইলে ড্রাইভার। ইস্কাপন আঙুল দিয়ে দেখালে—ওই দেখুন ওইখানে। এখানে। সে ঠিক জায়গায় হাত দিলে।

কদর্য্য চেহারার একটা ভিখিরী!

ইস্কাপন বললে—মোটরের কাজ আমি খুব ভাল জানি মশায়। একটা কাজ দেন কেনে!

*   *   *

এ—আর—পির এ্যাম্বুল্যান্স।

নীল কোর্ত্তা নীল প্যাংলুন পরে ইস্কাপন গাড়ী চালায়। কাজ পেয়ে গিয়েছে সে! ইস্কাপন বলে মানুষের দশা—কখনও হাতী কখনও মশা। ছিলাম হাতী, হয়েছিলাম মশা—ফের হলাম হাতী। নসীব কা খেল। তুনিয়া গোলক ধাঁধা ভাই—নিমেষে ফক্কিকার।

গাড়ীতে ব'সে সে সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে টানে। অন্য লোকেরা ষ্ট্রেচারে তুলে বয়ে নিয়ে আসে তুঃস্থ মরনোন্মুখ ভিখিরীদের। গাড়ীর ভেতর তু-থাকি ক্যাম্বিসের ষ্ট্রেচার। ষ্ট্রেচারগুলো ভর্ত্তী হয়ে গেলে ইস্কাপনের গাড়ী চলে হাসপাতালের দিকে। ওদের নামিয়ে দিয়ে আবার চলে গাড়ী কে কোথায় পথের পাশে মরেছে—তার সন্ধানে।

তুর্গন্ধে পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ইস্কাপন জোরে সিগারেটে টান মারে। গাড়ীর ভিতর শুয়ে কাতরায় হতভাগারা। ইস্কাপন আপন মনেই বলে—"কেশে বরে নিয়ে যাবে মিনতি কাহিনী শুনবে না।" তারপর হঠাৎ বলে ওঠে—শা-লা!

হাসপাতালের পথেই কত লোক দাঁত খিঁচিয়ে মরে যায়।

ইস্কাপন তাতেও বলে—শা—লা!

মরুক! ইস্কাপনের ওই মড়া বয়েই পেট চলছে, তাই তার লাভ। শুধু পেট চলা! মাথায় গন্ধ তেল মাখে ইস্কাপন, সিগারেট খায়, কোর্তা পাংলুন পরে কাবুলী স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়, সন্ধ্যের পর অফ

ডিউটীতে ইস্কাপন তো রাজা। দেশী মদের দোকানে ঢুকে—চোখে রঙ ধরিয়ে—সিগারেট মুখে দিয়ে সে বস্তীর দিকে হাঁটে। মধ্যে মধ্যে টর্চ জ্বেলে আশপাশ দেখে!

শা—লা! আপন মনেই সে বলে—সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে তার কদর্য্য পুরু কালো ঠোঁটে; গুণ গুণ করে সে গান ধরে—'হেসে নাও ছ'দিন বই তো নয়'! তার ছেলে বেলায় গ্রামের সখের থিয়েটারে সে গানটা শুনেছিল।

যমের গাড়ীর চাকরী। যত মরবে মারুক—সে পিছপাও হবেনা। গাড়ীতে তেল থাকলেই হ'ল—ষ্টীয়ারিং ধরে সে ঠিক ট্রিপ মারবে ঝপঝপ। 'চলো মুসাফের, বাঁধো গাঁঠেরী'। বেশী দূর নয় বাবা—বৈতরণীর ফটক পর্য্যন্ত সে হাজির করে দেবে। দিন গেলে ত্রিশ চল্লিশ আসামী নিয়ে চলে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়—হায়—হায়—গৌরদাদার সেই ছেলে ক'টা আর বউটাকে সে গাড়ীতে পুরে যদি চালাতে পারত!

যমের গাড়ীর ড্রাইভার সে। তফাৎ চলো বাবা। সে হর্ণ দেয়—আর কল্পনা করে—হর্ণের শব্দের মধ্যে সে ঠিক বলছে—যমপুরী! যমপুরী! যমপুরী!

এর ওপর মধ্যে মধ্যে বাজে সাইরেন! জাপানীরা আসে বোমা ফেলতে। ইস্কাপন রেডী হয়ে বসে ষ্টীয়ারিং ধরে। হুকুম হলেই তার গাড়ী ছুটবে। নিয়ে আসবে বোমার ঘায়ে যমপুরীর যাত্রীদের বোঝাই করে।

যেদিন বেশী মদ খায় রাত্রে—সেদিন তার মনে হয়—সব মরে যায়! সে গাড়ী বোঝাই করে হর্দ্দম নিয়ে গিয়ে ফেলে। ঝপাঝপ! ঝপাঝপ! ঝপাঝপ!

*　　　　*　　　　*

সেদিন রবিবার। বেলা বোধ হয় দশটা। ইস্কাপন বসে সিগারেট টানছিল অলসভাবে। প্রকাণ্ড একটা হাতার মধ্যে খাপরার ছাউনী

করা শেডের মধ্যে গাড়ীগুলো রয়েছে। মুখ সব রাস্তার দিকে। ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি তেল। সব তৈয়ার অবস্থায় রয়েছে। রবিবারটা—খুব হুঁসিয়ারীর বার। তবে দিনের বেলায় নয়, রাত্রি বেলা। এ দিন আর ছুটি নাই। রবিবারেই আসে জাপানীরা! সন্ধ্যের পর কখন যে ককিয়ে বেজে উঠবে সাইরেন তার কোন ঠিকানা নাই। রবিবারে আমেজটা ইস্কাপন দিনের বেলাতেই সেরে নেয়। লুকিয়ে রাখা শিশি থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে ইস্কাপন মৌজ করে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ইস্কাপন। যাঃ শালা দিনের বেলাতেই এল না কি জাপানীবা? আসুক না—আসুক—ছুটল ইস্কাপন গাড়ীর দিকে! তৈয়ার—তৈয়ার থাকতে হবে!

আকাশে প্লেনের শব্দ উঠল। গাড়ীর সিটে বসেই পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আকাশের দিকে চাইলে। সাদা ঝকঝকে—বকের ঝাঁকের মত এক ঝাঁক প্লেন চলে গেল।

ইস্কাপন বললে—শা—লা!

ছুটছে ইস্কাপনের গাড়ী। খিদিরপুর ডক। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে—জাহাজ জ্বলছে, বাড়ী ভেঙে পড়েছে; চারিদিকে পড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। হাত পা—মুণ্ডু—ঘিলু রক্ত! আঁশটে গন্ধ উঠেছে।

ইস্কাপনের গাড়ী বোঝাই। ছুটছে। হাসপাতাল। হাসপাতাল থেকে আবার খিদিরপুর। আবার হাসপাতাল। আবার খিদিরপুর। আবার হাসপাতাল। ওদিকের হাসপাতাল বোঝাই। চলো এবার মিটিয়া কলেজ!

গাড়ী ছুটছে। ইস্কাপনের মনে হচ্ছে চারিদিকের বাড়ি ছুটছে পিছনের দিকে। ছুটছে। ষ্টীয়ারিং ধরে আছে ইস্কাপন! চোখ সামনের দিকে। যমের বাড়ীর যাত্রী নিয়ে চলেছে সে। যমের গাড়ী! গাড়ী থামে। জখমী নামায় লোকেরা। ইস্কাপন আড়ালে গিয়ে শিশিতে মুখ লাগায়। চোখ লাল হয়ে ওঠে! মাথার মধ্যে আগুন

জ্বলে। চলো মুসাফের—বাঁধো গাঁঠেরী! শা—লা! গাড়ী ছোটে হু—হু করে। পাশের লোক এস্ত হয়ে ওঠে।—এই—এই! করছিস কি? স্পীড কমিয়ে দে! এই—এই!

ইস্কাপন হাসে। বহুদূর জানা হৈ! চলো মুসাফের!

এই! এই! রোখো গাড়ী! রোখো!

—ছুটি—ছুটি! ছুটি দাও আমাকে! ছুটি!

পাশ থেকে জোর করে ঠেলে ইস্কাপনকে সরিয়ে পাশের লোকটি গাড়ীর ষ্টীয়ারিং ধরে, ফুট ব্রেকে পা দেয়। কিন্তু তার আগেই গাড়ী-খানা গিয়ে ধাক্কা মারে সামনের লাইট পোষ্টে।

ইস্কাপনের মনে হয় লাইট—পোষ্টটাই যমরাজা। ধাক্কা মারবার মুহূর্ত্তটিতেই সে সেলাম বাজিয়ে বলে—সেলাম হুজুর!

শেষ কথা

লাট ভরতপুর, পরগণে পূর্ববচক, সম্পত্তিটা খুব বড় সম্পত্তি। সবাই বলে, সোনার সম্পত্তি। গাছের পাতা কুলোর মত, ডাল ঢেঁকির মত ; ঘসা হরিচন্দনের মত মোলাম মাটি—গায়ে মাখলে গা জুড়িয়ে যায়. ফসলের বীজ পড়বার অপেক্ষা—দেখতে দেখতে ফসলে ভ'রে যায় মাঠ ; তা ছাড়া ভরতপুরে না পাওয়া যায় কি ? সোনার সম্পত্তি কথাটাও কথার কথা নয়। আগে লোকে নদীর বালি থেকে সোনার দানা বের করত। মাটির তলায় সত্যিই সোনা আছে। প্রজারা সব বেকুবের দল। চাষ ক'রে খায়, মার খেয়ে হাসে, বলে, তুমি কি আমার পর ? তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, হাতে লাগে নাই তো মারতে গিয়ে ! পরনে খেঁটে কাপড়, কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় তুলসীমালার কণ্ঠী, কালো রঙ। এ থেকেই বেকুবত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। চাষ ক'রে খায়—চাষীর দল সব। জমিদার-পক্ষ বলে, চাষা। আগে খেত-দেত, চাষ করত, তামাক টানত, পূজা-অর্চ্চনা করত, ঘুমুত। এখন আর সে কাল নাই, কলি বোধ হয় চার পো পূরা হয়ে উঠেছে. তারই ফলে আজকাল আধপেটা খায়, রোগে হাঁপায়, কোন রকমে চাষ করে, ভগবানকে কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না, অর্থাৎ কেউ কাঁদে, কেউ ব'সে ব'সে দাঁত খিঁচোয়।

পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন ভরতপুরের জমিদার। আগে ছিল, মঙ্গলকোটের মিঞাদের জমিদারী। সাউ মশায়েরা তখন এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। মিঞাদের ঘরোয়া ঝগড়া বাধলে, এক পক্ষ সাউদের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। ধার সহস্র ধারায় যখন বাড়ে, তখন কি আর রক্ষা থাকে ? তার উপর

এই যে চাষী প্রজাদের মাতব্বর, তারাও সেকালে মামলায় প্রায় সবাই সাক্ষী দিয়েছিল—এই সাউদের তরফে।

যাক ওসব কথা। তবে এখন ওরা নিজের গালে— ; ও কথাও যাক, পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নাই। বিস্তারিত বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে! একেবারে হালের কথাই ভাল। পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন জমিদার। গাঁয়ে গাঁয়ে কাছারি, কাছারিতে কাছারিতে নায়েব, বড় কাছারিতে বড় নায়েব ; এ ছাড়া পদ্মাপারে নিজের দেশ থেকে আমদানি করা পাইকের দল এনে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছেন সাউ মশায়েরা। এ ছাড়াও সাউ মশায়দের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে এসে বহু দোকানদানি খুলে ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অনেক কলকারখানাও বসিয়েছেন, এখানকার অনেক লোক আজকাল কলেও খাটে। এই সব লোকেরাও কেউ বা দাঁত খিঁচোয়—কেউ বা কাঁদে। তা কাঁদুক আর দাঁত খিঁচোক—দিন চলছিল ভালয় মন্দতে। জমিদারের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গাছের মালিকানি নিয়ে ঝগড়া ক'রে, জমির স্বত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়ে, পাইকদের খোরাকী রোজ প্রভৃতি নিয়ে 'না না' ক'রে, সাউ দোকান-দারদের সঙ্গে নুনের দর, তেলের দর, কাপড়ের দর নিয়ে বাকচাতুরি ক'রে, কলকারখানার মজুরি নিয়ে বিসম্বাদ ক'রে নানা টক-ঝকের মধ্যে দিয়ে দিন চলছিল এক রকম ক'রে। ঘানির চারপাশে চোখ-ঢাকা বলদের শিঙ নেড়ে পাক খাওয়ার মত সবই চলছিল। তেলও বের হচ্ছিল—সে নিচ্ছিল কলু, আর খোলও হচ্ছিল - তা খাচ্ছিল বলদে।

হঠাৎ ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠার মত সব ন'ড়ে উঠল। ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। সাউ জমিদার মশায়দের সঙ্গে হলদীবাড়ির সাঁই জমিদারদের সীমানা নিয়ে ফৌজদারি বেধে গেল। বেমক্কা ফৌজদারি, বলা নাই, কওয়া নাই, নোটিশ নাই, পত্র নাই, সাঁইবাবুদের পাইকদের দল হঠাৎ বন-বাদার ভেঙে লাঠি সোটা সড়কি বল্লম নিয়ে ভরতপুরের

পাশের লাট—লাট ধর্ম্মপুরে চড়াও হ'ল। কাছারিতে ঢুকে—মারধর খুনজখম ক'রে দখল ক'রে নিলে সব। সাউবাবুদের দল এসে ভরতপুরের কাছারিতে ঢুকল। শুধু তাই নয়, সাঁইদের লোকজনদের ব্যাপার দেখে ভরতপুর সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ ঘ'টে গেল। লাঠি-সোঁটায় তেল মাখিয়ে তলোয়ারে শান দিয়ে এমন তোড়জোড় আরম্ভ করলে যে, ভরতপুরে ঢুকেও যে তারা শেষ পর্য্যন্ত একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে, এতে আর কারও সন্দেহ রইল না। চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ভরতপুরের কাছারিতে কাছারিতে সাজ সাজ রব উঠল।

চাষীর দল চমকে উঠল। দুই লড়ায়ে ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাসের মত দশা তাদের। তারা সব চঞ্চল হয়ে উঠল।

বুড়া লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো ক'রে চুল ছাঁটা, দাঁতগুলি সব প'ড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়া ভাবনায় মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

দলে দলে ভবতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়াকে ঘিরে বসল।

সসম্মানে হাত জোড় ক'রে বুড়া ফোকলা দাঁতে, মায়ের কোলের শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপ খুড়া ভাই বোনদের দেখে, সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।

সকলে ব'সে গেল। তারপর বললে শুধু একটি কথা, কর্ত্তা। ওই একটি কথাতেই সব ওদের বলা হয়ে গেল। কর্ত্তাও সব বুঝে নিলে।

বুড়ার সুখেও হাসি, দুখেও হাসি, ভাবনাতেও হাসি, বুড়া ভাবতে ভাবতে হাসতে লাগল।

গৌরপুরের একজনা বললে, সাউবাবুরা আমাদের জমির মালিকানি মানছে নাই। আমরা কেনে ছাড়ব সুবিধে? সাউয়েরাও জমিদার, সাঁইয়েরাও জমিদার—তা সাঁইয়েরা যদি আমাদের জমির মালিকানি মানে, তবে উয়াদের হয়েই সাক্ষী দাও না কর্ত্তা।

বুড়া ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁ-হু। পাপ হবে।

একজনা বললে, তবে আমরাও জুটে পুটে লাগাই ফৌজদারি, এস।

বুড়া ঘাড় নাড়লে, উঁ-হু।

কেনে, ভয় লাগছে নাকি?—ছোকরা রুখে উঠল।

বুড়া হাসলে। সে হাসির সামনে ছোকরা এতটুকু হয়ে গেল। বুড়া হেসে বললে, ভয় নয় রে ভাই, পাপ হবে।

তবে? তবে কি করবে বল? কিসে পাপ হয় না, তাই বল?

হুঁ। দাঁড়া রে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে। তবে তো!

রতনলাল বললে, যা হয়, চটপট ঠিক ক'রে ফেল কত্তা। তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।

বুড়া হাসলে; রতনের উপর তার অনেক ভরসা। ভারী ভাল ছোকরা। আর তেমনই কি সাহস!

ঠুকঠুক ক'রে বুড়া কাছারিতে এসে উঠল, রাম রাম গো লায়েব মশয়!

কে, লালমোহন? এস এস।

হ্যাঁ, এলাম একবার।

এলম-টেলম নয়। লেগে যাও, সব কোমর বেঁধে লেগে যাও একবার। সাঁই-বেটাদের একবার মেরে বেচপাট ক'রে দিতে হবে, একধার থেকে কেটে ফেলতে হবে।

বুড়া হাসলে। কি যে বলেন লায়েব মশায়?

কেন?

ওই! কেটে ফেলালে রক্ত পড়বে যে গো! ম'রে যাবে যে লোকগুলান। পাপ হবে যে! বুড়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

নায়েবের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্ব'লে গেল বুড়ার এই ভণ্ডামি দেখে। তবুও লোকটা খাতিরের লোক, তাই রাগ ক'রেও ভদ্রভাবে

বললে, হুঁ বুঝেছি। ওদের রক্ত দেখে তোমাদের চোখে জল আসছে! বুঝতে পারছি সব। ব'লে খসখস ক'রে কয়েক ছত্র লিখে আবার বললে, আর আমাদের পাইকদের যে খুন-জখম করেছে, রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তার বেলায়—

বুড়ার ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, চোখের জল দ্বিগুণ হয়ে গেল, হে ভগবান! সে কথা শুনে ইস্তক কাঁদছি নায়েববাবু, আঃ— হায় হায় হায়! কত লাগল তাদের ভাবেন, দেখি? সে চোটগুলান মনে হয়, আমারই বুকে পড়ল গো।

নায়েব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা ভণ্ড-পাষণ্ড, না সত্যই সাধু? ভেড়ার শিঙে ধাক্কা লাগলে নাকি হীরের ধারও ভেঙে যায়, ঠিক তেমনই নায়েবের ইস্পাতের ভ্রমরের পাক দেওয়া শক্ত ধারালো বুদ্ধিও বুড়ার ভোঁতা বুদ্ধির ঘরের দরজায় ঠিক গর্ত্ত করতে পারছে না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নায়েব বললে, তা হ'লে? তা হ'লে কি করতে হবে শুনি?

তাই তো বুলছি গো আপনাকে। চোখের জলের মধ্যেই আবার বুড়ার হাসি ফুটে উঠল।

কি বলছ?

বুলছি, আমাদের জমির মালিকানাটি মেনে লাও তুমরা, সব পাইক বরকন্দাজ নিয়ে তফাত হয়ে থাক, দেখ সাঁইদের আমরা রুখে দি।

রুখে দেবে? ফৌজদারির কি বোঝ তোমরা? চাষ কর খাও। লাঠি ধরতে জান? সড়কি চালাতে জান?

বুড়া হাসলে।

হাসছ যে?

আপনার কথা শুনে হাসছি গো। আমরা লাঠি সড়কি ধরবই নাই যে।

তা হ'লে কি ক'রে রুখবে?

উয়ারা আসবে, আমারা পিঠ পেতে দাঁড়াব, লাও, মার লাঠি। বুক পেতে দিব, চালাও সড়কি। আমাদের রক্ত পড়বে, মাটি লাল হয়ে যাবে, আমরা মরব। তখন উয়াদের আক্কেল হবে, বুকগুলান টনটন করবে, চোখে জল আসবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। উয়ারা লাজ মেনে ফিরে যাবে।

নায়েব হা-হা ক'রে হেসে উঠল, এই তোমার বুদ্ধি ?

বুড়ো কিন্তু আশ্চর্য্য। সে এতটুকু অপ্রতিভ হ'ল না। তারও দন্তহীন মুখে সেই আশ্চর্য্য ছেলেমানুষী হাসি ফুটে উঠল। হয় গো, হয়। আমার মন শুধালে যে ভগবানকে। ভগবান যে বুললে গো! আপনাদের মন যে ভগবানকে কিছু শুধায় না গো! না হ'লি বুঝতি পারতে আমার কথা।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী ; বুড়ার বুড়ীটি ঠিক ক্ষ্যাপার ক্ষেপীর মত।

সমস্ত শুনে সে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তাটা তার বুড়ার মতই সাউ নায়েবের জন্য চিন্তা। এ তো সহজ কথা, সোজা কথা। উয়ারা কেনে বুঝতে লারছে? হ্যাঁ গো বুড়া?

সেই তো গো বুড়ী।

তবে কি হবে? কি করবে তুমি?

আমি? অনেক ভেবে বুড়া হাসলে, হ্যাঁ, হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কি?

আমি মরব।

মরবে?

হ্যাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি, তবে তখন উয়ারা মনে দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখুন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।

বুড়ী কিছুক্ষণ ভাবলে। ভেবে সে খুশি হয়ে উঠল। হেসে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, ঠিক বুলেছ তুমি।

বুলি নাই ? হেসে বুড়া বুড়ীর দিকে তাকালে।

হ্যাঁ। তাই কর তুমি। মর। ম'রে উয়াদিগে বুঝায়ে দাও।

বাইরে থেকে ডাকলে রতনলাল, কত্তা !

বেটা ! আয় রে বেটা, আয়। লালমোহনের মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

রতনলাল এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। বললে, সব এসে দাঁড়িয়ে আছে কত্তা। কি হ'ল, কি করব তাই বল। রতন যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

বুড়া বাইরে এসে জোড়হাত ক'রে বললে, নমো পঞ্চ।

তার আগেই কিন্তু একটা গণ্ডগোল ঘ'টে গেল। সাউবাবুদের পাইক বরকন্দাজ এসে সব ঘিরে দাঁড়াল। সাউবাবুদের সদর-নায়েব চারু শীল, জাঁদরেল নায়েব। সে কারও তোয়াক্কা রাখে না, সে এখানকার নায়েবকে হুকুম পাঠিয়েছে, পাগলাটাকে পাকড়ে আটকে রাখ। শুধু পাগলা নয়, রতনলাল-টতনলাল চেলাচামুণ্ডা তামাম আদমী আটক করো—বিলকুল।

বুড়া হেসে বললে, চলো। রতনলাল প্রভৃতি চেলাদের দিকেও চেয়ে বললে, চলো বেটালোক।

বুড়ী একগাল হেসে এগিয়ে এসে বললে, আমি ?

সাউবাবুদের লোক বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে হুকুমও আছে।

বুড়ী বললে, দাঁড়া বাবা, জেরাসে সবুর করো বেটা ; বুড়ার কৌপীন, আমার কাপড় আর সেই লোটাটা নিয়ে নিই। ওই লোটাটাতে জল না খেলে আমার তিয়াস মেটে না।

বুড়া হেসে ঘাড় নাড়ে, হাজার হ'লেও মেয়েলোক কিনা। লোটার মায়া ছাড়তে পারে না।

সাউবাবুরা বুড়াকে আটক করলেও খুব যত্ন ক'রেই রাখলে। সে দিক দিয়ে তারা এতটুকু কসুর রাখলে না। বুড়া কিন্তু সেই বুড়া, আটকের মধ্যে থেকেও হাসে ; ভগবানকে ডাকে, আর ভাবে। মনে মনে বলে, ভগবান, আমার মনকে বুলে দাও. কি করব ? মরব ? আমি মরলে উয়ারা তুখ পাবে ? তুমি উয়াদিকে জ্ঞান দিবে ?

বুড়ী আটকের মধ্যেই ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়, বুড়ার খাবারটি করে, বিছানা আনে কম্বলটি ঝাড়ে, লোটাটি ঝকঝকে ক'রে রাখে। তার যেন এ অবস্থাটা খানিকটা ভালই লাগে। বুড়াকে অনেকটা কাছে পেয়েছে। বাইরে তো বুড়ার হাজার কাজ, এক লহমার ফুরসৎ হয় না তুটা কথা বলবার, ঘরোয়া কথা বলবার। সব কথাই তার ভরতপুরের কথা, নয়তো মানুষের কথা। আজ এখান, কাল সেখান, এ আসছে, সে আসছে, লোকজনেই বুড়াকে ঘিরে রেখে দেয় ; এখানে বুড়ার অনেকটা কাছে আসতে পেয়েছে সে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই বুড়ীর ভুল ভেঙে গেল। বুড়া সেই বুড়া। লোকের ভিড় নাই, কিন্তু বুড়ার মাথায় ভাবনার ভিড় এতটুকু কমে নাই। লোকে বাইরে বলত, বুড়াটি পাথর। বুড়ীর মনে হয়, কথাটি মিথ্যা নয়।

সে বলে, বুড়া !

উ ? বুড়া তার দিকে তাকায়, বুড়ীর মনে হয়, বুড়া তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—কোন্ দিকদিগন্তরে, অনেক দূরে, সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চুড়ার দিকে।

কি ভাবছ ?

ভাবছি ? বুড়া হাসে।

হেসো না বুড়া, এ হাসিটি তোমার ভাল লাগছে নাই আমার।

হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ ব'লে বুড়া চুপ ক'রে যায়।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় বুড়ী, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে, ভগবান, বুড়াকে বাঁচিয়ে রাখ। না হ'লে এত ভাবনা ভাববে কে ?

হঠাৎ একদিন বুড়া বললে, আমি মরব।

বুড়ির বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই। বুড়া তা হ'লে এমন হাসি হেসে শুধু বলবে, ছি! তাতেই বুড়ী মরমে ম'রে যাবে। সে শুধু বললে, কেনে বুড়া? মরবে কেনে?

মরব। সাহাবাবুরা বুলছে, আমি বাইরের লোকগুলিকে বুলে এসেছিলাম, ফৌজদারী দাঙ্গা করতে। বাইরের লোকগুলির সঙ্গে বাবুদের পাইকের মারপিঠ হয়ে গিয়েছে। আমাদের লোকগুলি উদিকে মেরেছে, অনেক ক্ষেতি করেছে। বাবুরা বুলছে, ই সব আমার শিক্ষা।

রতনলাল বললে, তার লেগে তো কত্তা, বাবুদের পাইকরা লোকদেরও খুব মার দিয়েছে।

বুড়া ঘাড় নেড়ে হাসলে। বললে, শুধু তাই লয় রতন। আমাদের লোকেরা মারলে যখন, তখন লোকদের পাপ হ'ল। আমি মরি, ম'রে ভগবানকে বুলব, ভগবান, তুমি পাপটি ক্ষমা কর, শুধু আমাদের পাপ লয়, ওই পাইকদের পাপও ক্ষমা কর। আর—

আর কি কত্তা?

বুড়া হাসলে। তবে তো উয়ারা বুঝবে, আমি পাপী লই।

বুড়া মরণ-পণ ক'রে বসে। খায় না, দায় না, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে।

বুড়ির কথাবার্ত্তা সব ফুরিয়ে গিয়েছে যেন, সে চুপ ক'রে ব'সে চেয়ে থাকে। হায়, বুড়া তার হারিয়ে গেল। তার দিকে একবার ফিরে চাইবারও ফুরসৎ নাই। কান্না, লজ্জা, বুড়ীর কাঁদবারও উপায় নাই।

আটকখানার বাইরে হৈ-চৈ উঠে, ভগবান, আমাদের কর্ত্তাকে বাঁচিয়ে দাও।

রতনলাল আর সব চেলারা যেন উদাস হয়ে গিয়েছে।

বুড়ী আর থাকতে পারে না। সে বুড়াকে কিছু বলতে সাহস করে না। সে ভগবানকে মনে মনে ডাকে, বলে, বুড়াকে বাঁচাও দেবতা। এতগুলি লোকের মুখের দিকে চাও। আমার মুখের দিকে চাও। বুড়ীর মনে হয়, বুড়ার চেয়ে ভগবানেরও মন নরম।

বুড়ীর মনে হয়, ভগবান যেন হাসছেন।

বুড়া সত্যিই মরে না। মরণের সব লক্ষণই হয়েছিল, সাউবাবুরা বড় বদ্যিও পাঠিয়েছিল, তারাও বলেছিল, আমাদের অসাধ্য। না খেলে মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তবু বুড়া বাঁচে। আশ্চর্য্য বুড়া, সব সময়ের মধ্যে একটিবারও তার মুখের সেই খোকার ঠোঁটের হাসির মত হাসি মিলিয়ে যায় নাই। ধীরে ধীরে সব মরণ-লক্ষণ মিলিয়ে গেল, চোখের ঘোলা রঙ ঘুচে গিয়ে সাদা সাদা পদ্মের পাপড়ির আভা ফুটে উঠল, মুখের রঙে ফুটে উঠল মায়ের কোলের ছেলের মুখের মত ঝকঝকে রেশ। বুড়া বললে, আমি বাঁচলাম। ভগবান আমার মনকে বুললে, তোর পাপ নাই।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, বুড়া আমি এইবার মরব।

কেন ?

আমার শরীর খারাপ লাগছে। আর—

আর কি ?

বুড়ী কিন্তু কিছুতেই সে কথা বললে না। শুধু হাসলে।

বুড়ী সত্যিই মারা গেল। জ্বর হ'ল সামান্য। সেই জ্বরেই মারা গেল। মরবার সময় একদৃষ্টে সে চেয়ে ছিল বুড়ার মুখের দিকে।

পাথরের বুড়া। লোকে মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ বুড়ীর মনে হ'ল লোকের কথা মিথ্যে, মিথ্যে ; সত্যি নয়, সত্যি নয়। বুড়ার চোখে জল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুড়ার চোখে জল।

সে বললে, বুড়া !

চোখে জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ী, কি বুলছ, বল?

মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ল, ঝ'রে পড়ল বুড়ীর কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বললে, না থাক।

আখেরী

১৩৫০ সালের চৈত্রের শেষ, ইংরাজী ১৯৪৪এর এপ্রিল। পার্কের নিঃশেষে-পাতা-ঝ'রে-যাওয়া কৃষ্ণচূড়াগাছে ফুলের কুঁড়ির স্তবকগুলা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, মাথার দিকে লালচে আভা গাঢ় হয়ে এসেছে; কাঠমল্লিকা ফুটেছে অজস্র, আরও অনেক ফুল ফুটেছে; বসন্ত চ'লে গিয়েছে, গরম পড়েছে, ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ, কিন্তু তার মধ্যে আর সে দখণে হাওয়ার মিষ্টতা নাই।

ভোরবেলা। ঝাড়ু পড়ছে রাস্তায়। জল দেওয়ার শ্রমিকেরা এসে হাঁকছে। ফুটপাথে এখনও লোক শুয়ে আছে।

বাগবাজার-শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ছোট চায়ের দোকান। পাশে একটা বিড়ির দোকান ত্রিশঙ্কুর মত, অর্থাৎ কাঠের কুলুঙ্গির উপর। বিড়িওয়ালা হুসেন, চায়ের দোকানের অমূল্য এখনও ঘুমুচ্ছে। ভোরের বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, তাতে এখনও পেট্রোল-মোবিলের ধোঁয়া মেশে নাই; বাস ছাড়তে শুরু করে নাই। মিলিটারি লরি সবে চলতে আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে এক দল লরি; হরেক রকম মাল এবং মানুষ অর্থাৎ সেপাই বোঝাই নিয়ে চলেছে, লালচে ধূলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে।

চায়ের দোকানটার এ পাশে একটা মিষ্টির দোকান। এ দোকানটা এর মধ্যে চালু হয়েছে। উনানে আঁচ গনগন করছে, কড়াইয়ে ঘি তেতে উঠেছে, মোটাসোটা কারিকরটি জিলিপি ছাড়ছে, একজন একটা ছোট ঝুড়িতে বাসী—মানে, অচল বাসী কচুরি মিষ্টি গুঁড়ো ক'রে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে কাক-ভোজনের জন্য; ট্রামের তার থেকে রাস্তার উপর নেমে এসেছে কাকের ঝাঁক। গোটা দশেক ভিখিরীর ছেলেও তাদের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদিক থেকে আসছে যুদ্ধের

কারখানার শ্রমিকবাহী লরি। তারই মধ্যে আছে খাস-আমেরিকান-বাহী বাস। বিশ-ত্রিশ হাত লম্বা, রেলের ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ির মত চেহারা, মাথায় পাঁচটা লাল আলো, পিছনে তিনটে, তার মধ্যে মাথার দুটা সর্ব্বদাই জ্বলছে, নীচেরটা জ্বলে উঠছে গাড়িটা থামলেই, আবার চললেই নিবে যাচ্ছে। ওদিকের ফুটপাথে চলেছে গঙ্গাস্নানের যাত্রী। পুণ্যকামী মেয়েরা, স্বাস্থ্যকামী বাবুরা, গাজনের সন্ন্যাসব্রতধারী মেয়েপুরুষ। দ্বারিক ঘোষের দোকানের পাশে পঞ্চাশের কঙ্কালের দল ফেলে-দেওয়া দইয়ের খুরি, এঁটো পাতা কুড়িয়ে চাটতে বসেছে। ক'জন রুগ্ন পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ধুঁকছে। ঝুড়িতে বোঝাই তরকারি নিয়ে দেহাতি হাটুরেরা চলেছে বাজারে। খবরের কাগজওয়ালারা সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটছে।

হঠাৎ যে লোকটা কাক-ভোজনের জন্য কচুরিগুঁড়ো ছড়াচ্ছিল, সে চীৎকার ক'রে উঠল, অ্যাই! জিলিপি-ভাজছিল যে, সে ব'লে উঠল, শালা!

একটা কাককে চাপা দিয়েছে একখানা লরি। যাক, ছোঁড়া তিনটে বেঁচেছে! যে জিলিপি ছাড়ছিল, সে বললে, আর থাক। ছিটুস নি আর। তারপর আবার বললে, গুপের জন্যে রেখেছিস তো? সে বেটা এখনও এল না যে?

ওই যে—ওই যে অমূল্যকে খোঁচা মারছে।

হুঁ। বন থেকে বেরুল টিয়ে লাল গামছা মাথায় দিয়ে। বেটা আনারস রাত্রে থাকে কোথা বল্ দেখি? এই! এই গুপে!

দশ-বারো বছরের বাচ্চা একটা। সতেজ আগাছার মত ছেলে। কাক চাপা প'ড়েছে দেখে নাচতে আরম্ভ করেছে। লে—খা—খা! খাঁয়ে যা কচুরি! কা! কা! কা!

জিলিপি-ভাজিয়ে কারিকর ধমক দিলে, মারব গিয়ে থাপ্পড়। কাক মরেছে, তাতে নাচন কিসের?

চায়ের দোকানের অমূল্য উঠেছে, সে বললে, দেখ না। ভারী পাজি!

গুপে হি-হি করে হাসছে। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল গুপের, সে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলে চেপ্টে-যাওয়া কাকটাকে। এঃ হে-হে রে! নির্দ্দম, একেবারে ছাতু ক'রে দিয়েছে! শালারা!

মাথার উপরে কাকের দল কলরব ক'রে উড়ছে। গুপের হাতে মরা কাকটাকে দেখে তারা তাকেই আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। গুপে কিন্তু 'শালারা' ব'লে তাদের গাল দেয় নি। দিচ্ছিল লরির ড্রাইভারকে।

কাকের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল। গুপে কাকটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল চায়ের দোকানে। দোকানে তখন চায়ের খদ্দের এসে গিয়েছে জন চারেক। দুজন হাফপ্যাণ্টের সঙ্গে কলার দেওয়া গেঞ্জি পড়েছে, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল, ওরা সব যুদ্ধের কারখানায় কাজ করে; একজন বাস-ড্রাইভার শিখ: একজন সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক।

অমূল্য বললে, খবরদার! মরা কাক ছুঁয়ে এলি, কিচ্ছু নাড়বি না তুই। বেরো বলছি, বেরো।

ওপারের ময়রার দোকানের কারিকর বললে, জাত গেল তোর। গঙ্গাচান ক'রে আয় গিয়ে।

ভদ্রলোক খদ্দেরটি হেসে বললে, কলে হাত ধুয়ে ফেল্ ভাল ক'রে।

দোকানের সামনেই জলের কল, গুপে সেইখানে কলের হাতলটা টিপে ধ'রে চান করতে ব'সে গেল। স্নান ক'রে ভিজে গায়ে ভিজে কাপড়েই এসে অমূল্যকে বললে, লে। হ'ল তো ইবার?

অমূল্য বললে, এই এই! কাপড় নিংড়ে ফেল্। এই এই!

গুপের সে দিকে গ্রাহ্য নাই, সে বললে, দে, দোকানীদের চা দিয়ে আসি। দেরি হয়ে যেছে!

ভদ্রলোকটি বললে, মুছে ফেল্ রে গা-হাত, অসুখ করবে।

উঁহু! ব'লেই সে অমূল্যকে ধমক দিয়ে বললে, দে না দোকানী-দের চা।

অমূল্য একখানা ট্রের উপর চারটে কাপে চা ঢালছিল, দুধ চিনি মিশিয়ে দেবার জন্য চামচে দিয়ে নেড়ে, ট্রেটা হাতে দিয়ে বললে, তুমি মর বাঁচ তাতে কিছু যায় আসে না, দোকানে যে কাদা হয়ে গেল কাপড়ের জলে।

মুছে দিব। গুপে চায়ের ট্রে হাতে চ'লে গেল ময়রার দোকানে।

ওই ব'য়ে দেওয়ার জন্য সে দোকানীর কাছে কাক-ভোজনের অচল বাসী খাবারের একটা ভাগ পায়। চায়ের ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে গুপে বললে, দাও।

হুঁ, দেব! বেটা শয়তান কোথাকার, নিজে তো ঘিয়ের খাবার খাস না, কাকে দিবি তাই বল্? নইলে দেব না।

সি একজনা আছে—দিব একজনাকে।

কাকে?

দিব। সি একজনা বটে।

অমূল্য হাঁকলে, ফাজলামি করিস নি ওখানে। খদ্দের আসছে। গুপে!

বাসী খাবারের ঠোঙা হাতে ক'রে গুপে এক ছুটে এসে দোকানে ঢুকল, এক কোণে রেখে দিলে ঠোঙাটা।

অমূল্য সেই ভদ্রলোকটিকে বলছিল, উ মরবে! আজ্ঞে না। কিচ্ছু হবে নি ওর। গেল সালের ঝড়ে ওর মা মরেছে দেওয়াল চাপা। দুর্ভিক্ষে বাপ মরেছে। নিজে—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললে, মা বাপ নাই ওর?

উত্তর দিলে গুপে, ভদ্রলোকের পাশের লোকটি সামনে চায়ের কাপ কেকের ডিশ নামিয়ে দিয়ে বার দু-তিন ক্ষিপ্রভাবে ঘাড় নেড়ে দিলে।

কোথায় বাড়ি তোর ?

উচ্ছিষ্ট কাপ-ডিশগুলো গুছিয়ে তুলছিল গুপে, বললে, হুই সেই মেদনীপুর জিলা ! সেই বহুলিয়া গাঁ আছে !

বহুলিয়া ?

হুঁ ! দেবপাল পোষ্টাপিস বটে।

হুঁ। ঝড়ে তোর মা মারা গেছে ?

কাপ-ডিশগুলো নিয়ে ততক্ষণে গুপে জলের ড্রামের নীচে কল খুলে ধুতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। হাতের কাজের বিরাম দেয় না। কাজ করে আর কথা বলে। এবার কিন্তু তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সবিস্ময়ে সে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি বলছেন ?

বললে অমূল্য, ঝড়ে তাদের ঘর উড়ে—

উঁহু ! ঝড় লয়, হাওয়াতে বটে।

হো-হো ক'রে হেসে উঠল খদ্দেরের দল। গুপে সবিস্ময়ে শুধু একবার তাকিয়ে দেখলে, বুঝবার চেষ্টা করলে, হাসির কারণটা কোথায় ? তারপর কাপ-ডিশের গোছা নিয়ে এসে নামিয়ে দিলে অমূল্যর টেবিলের উপর। বললে, হাসিস না ফ্যকফ্যাক ক'রে। কাজ কর্।—ব'লেই সে ন্যাতা নিয়ে ভিজে মেঝেটা মুছে ফেলে, হাত ধুয়ে ফেলে, বইতে আরম্ভ করলে চা-ভত্তি কাপগুলা, যেগুলা ইতিমধ্যে অমূল্য তৈরি ক'রে ফেলেছিল।

ভদ্রলোকটির বোধ হয় কৌতুহল হয়েছিল, এবং ভদ্রলোক হয় বেকার, নয় পয়সা আছে, সে আবার টেনে নিলে নতুন এক কাপ চা। খপ ক'রে গুপের হাতখানা ধ'রে বললে, হাওয়াতে তোদের ঘর উড়ে গেল, তোর মা চাপা পড়ল, তুই বাঁচলি কি ক'রে ?

অত্যন্ত সহজভাবে গুপে বললে, কেনে, হাওয়াতে চালটো উড়ে গেল, উঠানে একটা গাছ ছিল, সিটাতে ঠেকা খাঁয়ে পড়ল মাটিতে,

আমি ছুটে ঢুকলাম সিটার ভিতরে, আমার পাছু পাছু বাবা এল, মা আসবার মুখে ঘরের ছাল ভেঙ্গে পড়ল।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে এঁটো কাপ গুছতে আরম্ভ করলে। অমূল্য বললে, জল আন্। গুপে!

গুপে ছুটল বালতি নিয়ে! কলের নীচে বালতি পেতে কল টিপে ধ'রে তাকিয়ে দেখছিল সামনের পানের দোকানের আয়নাটার দিকে। হাসছিল আপনার মনে। মধ্যে মধ্যে খালি হাতখানা বুলাচ্ছিল আপনার মুখে কতকগুলা বসন্তের ক্ষতচিহ্নের উপর।

জলের বালতিটা নামিয়ে দিয়েই সে আবার এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। পকেট থেকে একটা ভাঙা চিরুনি বার ক'রে অত্যন্ত দ্রুত টেরি কেটে নিলে।

অমূল্য হাঁকছে ভিতর থেকে, গুপে! এই গুপে!

হুঁ, যাছি।

গেলি কোথায়?

যাছি।

তোমার পেটে লাথি মারব আমি। দত্তশীলের দোকানে চা দিতে হবে না?

গুপে ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল ফুটপাথের উপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে দাঁড়াল অমূল্যর কাছে।

দত্তশীলের দোকান কয়েকখানা দোকানের পরেই। গুপে বেরুচ্ছিল সেখান থেকে। সেই ভদ্রলোক তাকে বললে, দাঁড়া।

উঁহু, কাজ আছে। অমূল্য শালা বকবে।

তোর বাবা দুর্ভিক্ষে ম'রে গেছে?

উঁহু। অকালে মরেছে বাবা। চাল ছিল নি, কিছুই খেতে ছিল নি। যা পেত বাবা আমাকে খাওয়াত, নিজে খেত নি। তাথেই ম'রে গেল।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল! একটু অবিশ্বাসও হ'ল। ছেলেটা

কথাগুলা বলছে যেন উপকথা বলছে ; "আমার কথাটি ফুরুল নটে গাছটি মুড়ুল।"

গুপেই বললে, একদিন রাখালকাকার বাড়ি গিয়েছিলাম খাবার তরে। অনেকক্ষণ পরে খেতে দিলে। ফিরে এসে দেখলাম বাবা ম'রে-প'ড়ে আছে। রা কাড়ে না, কাঠের পারা শক্ত হঁয়ে গিয়েছে।

তারপর ?

তারপরে ? তারপরে চ'লে এলম কলকাতাতে।

কার সঙ্গে এলি ?

কত লোক এল। তাদের সঙ্গে এলম। আঠারো কোশ হাঁটলম। পা ছুটো এই ফুলে গেল। জ্বর হ'ল, গুটি বেরুল। সেই একটো গাঁয়ে প'ড়ে থাকলাম। তারপর আবার হাঁটলম। শেষে রেল-গাড়িতে চড়লম। চ'লে এলম কলকাতা।

ছুটে চ'লে যাচ্ছিল গুপে। ভদ্রলোক ডাকলে, শোন্, শোন্। এই নে দু আনা পয়সা নে।

গুপীনাথ মহা খুশি। পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললে, কি বলছেন বলেন ?

কে আছে দেশে তোর ?

একটু ভেবে গুপে বললে, ভাঙা ঘরটো আছে, ছুটো গাছ আছে উঠানে, তিন বিঘা জমি আছে।

আপনার লোক কে আছে ?

সি রাখালকাকা আছে। তা সি কাকা বটে; আপনার লোক লয়।

গুপে! গুপে! ওরে শূয়ার! সয়তান কোথাকার! গুপে কিন্তু চঞ্চল হ'ল না, হেসে বললে, অমূল্য হাঁকাড়ছে, আমি যাই।

ভদ্রলোকটি চেয়ে দেখলে, অমূল্য দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে। গুপী যেতেই সে তার মাথায়

বসিয়ে দিলে একটা চাটি! গুপে চীৎকার ক'রে উঠল, মারিস না, হাতের কাপ-ডিশ প'ড়ে যাবে, ভেঙে যাবে।

চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠেছে গল্প-গুজবে—খবরের কাগজ, যুদ্ধ, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতা, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী, দুর্ভিক্ষ, মড়ক।

গুপে কাজ ক'রে যায়। কাজ করার ক্ষমতা ওর অদ্ভুত। যে কাজগুলা বাকি পড়েছিল, সেগুলো ক্ষিপ্র হাতে নিপুণতার সঙ্গে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সেরে ফেললে। ওদিকে মড়ক থেকে বোমা এসেছে আসরে। একজন উত্তেজিত হয়ে বললে, এর চেয়ে বোমায় মৃত্যু ভাল। একবারে এক মুহূর্ত্তে মরে মানুষ।

গুপী এগিয়ে এসে লম্বা টেবিলের ধারে দাঁড়ায়, ঘাড় নাড়ে, না—না—না।

সকলে অবাক হয়ে যায়! ছোঁড়াটা বলে কি? গুপে বলে, আমি দেখেছি আজ্ঞা। উ রে বাবা রে!

দেখেছিস?

গুপীব চোখ বড় হয়ে উঠে, সে আকাশের দিকে চায়, বলে, সেই দিনে, খিদিরপুরে হুই জাহাজ-ঘাটায়, উঃ, বাবা রে! ছেতরে গেল মানুষগুলান, এমন কুটিকুটি ক'রে মাছ কুটে না মানুষ! কি আওয়াজ! উ রে বাবা রে! আগুন, ধুঁয়া, বাবা রে!

তুই ছিলি সেখানে?

হ্যাঁ, দেশ থেকে এসে হোথা গিয়েছিলম। কাজ করতম। বারো আনা পেতম দিন! বাবা রে! মড়ার গাঁদি নেগে গেল! নরিতে ক'রে নিয়ে গেল। বাবা রে! পালিয়ে এলম। ছুটু ছুটু হুই সাদা ঝকঝকে, পাখীর মত ঝাঁক বেঁধে এল, বাবা রে!

লোকে অবাক হয়ে যায়। অমূল্য বলে, তুই মরলি না কেন?

গুপী হাসতে আরম্ভ করে। বলে, ভেঁপু বাজতেই আমি

পালায়েছিলম। খালের ভিতরে লুকালম, হেঁই গুটিস্টুটি মেরে চুপ ক'রে পড়েছিলম। তারপরে, আমি যেন হেথা আর উঁই—উঁইখানে পড়ল বোমা। বাস্, দাঁত লেগে গেল আমার। তা বাদে উঠলম যখন, তখন এই মড়া ওই মড়া—হাত পা কুটিকুটি, রক্ত, আগুন, ধুঁয়া।

সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে যায়। গুপী বলে, চৌপর দিন আমি কেঁদেছিলম, খেতে নেরেছিলম তিন দিন, ঘুমুতে নারতম। গুপী এর পর উদাস হয়ে যায়। চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

জলদি এক কাপ চা। ঘরে ঢুকল একজন শিখ বাস-কণ্ডাক্টার।

চমক ভাঙল অমূল্যব। সে উনান থেকে তুলে নিলে গরম জলের কেৎলি? শিখটি ব'লে উঠল আরে গোপীয়া! তুম হিঁয়া আগেয়া?

গুপী তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলে, বললে, পাঁইজী! রাম-রাম, রাম-রাম পাঁইজী! হিঁয়া কাম করতা হামি আজকাল।

বাসমে আওর কাম করবি না? শিখ বলল।

অমূল্য অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, বাসেও কাজ করেছিস নাকি?

গোপী হাসে। তাড়াতাড়ি সম্ভ্রম ক'রে চায়ের কাপ নিয়ে শিখের সামনে নামিয়ে দিয়ে অমূল্যকে বলে, হ্যাঁ। শ্যামবাজার, কালিঘাট, মৌলালী, গোলতালাও, এসপ্ল্যানেড, আলিপুর, খিদিরপুর—তিন নম্বর—তিন নম্বর।

ভাগলি কেঁও রে তু? অ্যাঁ?

জ্বর হ'ল যি! তুমরা যি বললে, হাসপাতালে যা! পথের ধারে আমি শুয়েছিলম, আমাকে নিয়ে গেল নরিতে তুলে, কাঙালীদের হাসপাতালে।

কাঙালীদের হাসপাতালে! ডেষ্টিচুটদের মেডিকেল রিলিফ সে-টারে?

গুপী কথার সবটা বুঝতে পারে না। নিজের কথাই সে বুঝিয়ে বলে, যে পুলিসে নরিতে ক'রে ধ'রে নিয়ে যেছে। সেই কাঙালীদের হাসপাতালে। সেই সেখানে।

হুঁ, হুঁ। তাতেও মর নাই তুমি? কথাটা শুনে সকলে মুচকে হাসে।

গুপী গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না। চার দিন বাদে সেথা থেকে পালায়ে এলম। সনঝের সময়ে, চুপিচুপি। হঠাৎ থেমে যায়। কাজে মনোযোগী হয়ে উঠে।

শিখটি উঠে যাবার সময় গুপীকে ডেকে একটা আনি দিয়ে যায়। শিখের বদান্যতার ছোঁয়াচে আর দুজনে দেয় দুটো ডবল পয়সা। একজনে দিলে একটা সিকি।

দুপুরবেলা। চৈত্রের সূর্য্য প্রখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে, ভারী মোটরের চাকার টায়ারের দাগ বসছে। মধ্যে মধ্যে দমকা গরম হাওয়ার কালো ধূলো উড়ছে। তার উপর ক্রুড অয়েলের ধোঁয়ায় দুপুরের রোদ কালচে হয়ে যাচ্ছে। পথ জনবিরল। বড় রাস্তায় বাস ট্রাম একটু দেরিতে দেরিতে চলছে। শুধু মিলিটারি লরির বিরাম নাই।

চায়ের দোকানের সামনে বিড়িওয়ালা পরম কৌতুকে হাসছে। মিষ্টির দোকানের কারিকর খুব বাহবা দিচ্ছে। কয়েকটা ভিখারী ছেলে ব্যগ্র কৌতূহলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। অমূল্য এবং গুপীতে যুদ্ধ বেধেছে। অমূল্যর দাবি, গুপী যা বকশিশ পেয়েছে, তার ভাগ নেবে। গুপী দেবে না! এ ঝগড়ার সূত্র অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন গুপীর পাওনা লোভনীয় হয়ে উঠে নাই। চার পয়সা, দু আনা, বড় জোর দশটা পয়সার বেশি সে পেত না। আজ কিন্তু তার পাওনা আট আনা ছড়িয়ে গিয়েছে! অমূল্য বলে, দোকানে আমরা দুজনেই কাজ করি। যা বকশিশ

হবে, তার ভাগ দিতে হবে। দোকানে কাজ করিস ব'লেই দিয়েছে! দোকানের খদ্দেরে দিয়েছে!

গুপী কিন্তু দেবে না। সে বলে, তু যি পনের টাকা মাইনা পাস, আমি যি মোটে পাঁচটি টাকা পাছি। তুর মাইনার ভাগ আমাকে দে। তবে দিব। দোকানের খদ্দের তুকে দিলে না কেনে? আমাকে দিলে কেনে?

কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারি। গুপী বেরিয়ে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু অমূল্য দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উনানে-বাতাস-দেওয়ার পাখাখানা। গুপী ধরেছে উনান-খোঁচানো লোহার শিকটা। কিন্তু অসুবিধে হয়েছে, শিকটাও ছোট, তার হাতখানাও ছোট।

লম্বা হাতে অপেক্ষাকৃত লম্বা পাখার বাঁটটা দিয়ে অমূল্য পটাপট মার চালাচ্ছে। গুপী সরছে, কখনও গুঁড়ি হচ্ছে। কখনও চেষ্টা করছে শিকটা নিয়ে অমূল্যর হাতে আঘাত করতে। যুদ্ধ চলছে নিঃশব্দে।

ওপারের মিষ্টির দোকানের কারিকর মহা উৎসাহে বাহবা দিচ্ছে। তার ভুঁড়িটা নাচছে। বহুৎ আচ্ছা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ ভাই!

অমূল্য এগিয়ে এসে পড়েছে। এইবার ধরবে। আর উপায় নাই। কারিকর হেঁকে উঠল, ধর্ বেটাকে, ধর্। হি-হি-হি-হি!

গুপে কিন্তু অদ্ভুত। ধাঁ ক'রে সে ব'সে পড়ে ঢুকে গেল মালিকের বসবার চেয়ারটার তলায়। মাথাটা আটকাল কাঠের বসবার জায়গায়, চারিপাশে চারটে পায়া তার চারিদিকে রক্ষাবেষ্টনী হয়ে গেল। অমূল্যর আঘাতগুলা কাঠের পায়ায় ব্যাহত হয়ে যেতে লাগল। গুপী হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের মাথা দিয়ে গুঁতা দিতে দিতে এগুতে আরম্ভ করলে।

রাস্তায় হাসির হল্লা উঠে গেল—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ রে ভাই!

গুপী ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল অমূল্যকে। না পিছিয়ে অমূল্যর

উপায় ছিল না। সংকীর্ণ ঘর, তারই মধ্যে আবার লম্বা বেঞ্চ এবং চেয়ারে ঘরখানাকে সংকীর্ণতর ক'রে তুলেছে। আশেপাশে সরবার জো নাই।

ফুটপাথে এসেই চেয়ার মাথায় দিয়েই ছুটল গুপী, কিছুদূর গিয়ে ব'সে পড়ল। চেয়ারের তলা থেকে বেরিয়েই বললে, নিয়ে যা তোর চেয়ার। সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মিষ্টির দোকানের ধারে। দোকানের উনানে দেবার জন্য কয়েকখানা ইট থাকে, তাই একটা তুলে নিয়ে বললে, আয় ইবার। আয়।

সে একবার কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিলে গামছায় বাঁধা বাসী কচুরি-মিষ্টির গুঁড়োগুলো ঠিক বঁধা আছে কি না, তারপর বড় রাস্তাটার এপাশ ওপাশ চকিতে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ছুটল। ব'লে গেল, করব নি আর কাজ। আর আসব নি আমি।

*　　　*　　　*

রাত্রি দশটা।

চায়ের দোকান বন্ধ হয়েছে। মিষ্টির দোকান বন্ধ হচ্ছে। বিড়ি-ওয়ালার কাঠের কুলঙ্গি তালা-বন্ধ। অমূল্য আর বিড়িওয়ালা চলেছে সিগারেট টানতে টানতে। গঙ্গামুখে চ'লে গেছে যে রাস্তাটা, সেই রাস্তায় চলেছিল তারা। সমস্ত দিনের পর তারা চলেছে বিকৃত আনন্দের সন্ধানে। ব্ল্যাক আউটের পথ অন্ধকার।

অমূল্য হঠাৎ বললে, এই! দাঁড়া!

কি?

গুপে। ওই দেখ্। অন্ধকারের মধ্যে কালো শিলুয়েট ছবির মত ছোট একটা ছেলে কলের মুখ থেকে একটা কলসীতে জল ভ'রে নিচ্ছে। রাত্রি দশটায় জল আসে কলে। বিড়িওয়ালাও চিনলে, হ্যাঁ, গোপীই বটে।

চল্, দেখি ও কোথায় যায়।

রাস্তা পার হয়ে একটা খোলা জায়গা। কর্পোরেশনের জিনিসপত্র

থাকে। স্লিট-ট্রেঞ্চ আর পাকা খিলেন শেল্টারে ভর্ত্তি। গোপী চলেছে।

এই গুপে চমকে উঠল গোপী। কে? অমূল্য?

বিড়িওয়ালা বললে, কি করছিস ইখানে?

অমূল্য বললে, এইবার কি হয়?

গোপী বললে, দাঁড়া দাঁড়া। অমূল্য ভাই, দাঁড়া। সে ঢুকে গেল একটা খিলেন-করা শেল্টারের মধ্যে। পিছন পিছন ঢুকল অমূল্য আর বিড়িওয়ালা। ছোট একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। স্বল্প আলোর মধ্যে তারা দেখলে, গোপী কলসী থেকে জল নিয়ে কাকে দিচ্ছে, কিছু করছে। তারা এগিয়ে গেল।

বিড়িওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, পিছনে হাত দিয়ে অমূল্যর অগ্রগতি রোধ করলে। অবাক হয়ে গেল তারা। আশ্চর্য্য সুন্দর সতরো-অঠারো বছরের একটি মেয়ে। পরনের কাপড় রক্তাক্ত, কোলের কাছে রক্তমাখা একটি সদ্যজাত শিশু! মেয়েটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে! গোপী তার মুখে জল দিচ্ছে।

গোপী বললে, অমূল্য, কি করব?

ও কে?

উ বুবি বটে। খোকা হইছে বুবির। কি করব?

বুবি? বুবি কে?

হুঁ। বুবি, বুবি বটে উ।

কে রে তোর?

কে আবার হবে! আমি সেই কাঙালীদের হাসপাতালে ছিলম, সেথা ছিল বুবি; কালা বটে, শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে। উয়াকে লিয়ে হাসপাতালের নোকে যা তা বুলত। উ কাঁদত। তাথেই উয়াকে লিয়ে সাঁঝবেলাতে পালায়ে এলম। এইঠেনে উকে নিয়ে থাকি।

ওরা দুজনে পরস্পরে মুখের দিকে চায় বিচিত্র দৃষ্টিতে।

গোপী ব'লে যায়, বুবি বড় ভাল রে, ভারী ভাল। ভারী মায়া

লাগে। তাথেই তুকে পয়সার ভাগ দিই না। উর লেগেই আনি আমি কচুরি মিষ্টি কেক। বুঝলি? বুবিকে লিয়ে খোকাকে লিয়ে ঘরকে যাব। ঘর করব। তিন বিঘা জমি আছে। চাষ করব, বড় হব বিয়া করব। সে থামলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আমি এখুন কি করব অমূল্য?

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল ওদের দুজনের মুখের উপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সে চট ক'রে চ'লে গেল শেল্টারের মধ্যে। অমূল্য আর বিড়িওয়ালা দুজনে এবার ফিসফিস ক'রে কথা বলে। হঠাৎ চমকে উঠে গোপীর রূঢ় কণ্ঠস্বরে।

খুন ক'রে ফেলাব।

চকিত হয়ে দুজনে চেয়ে দেখে দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গীতে গোপী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা লম্বা শক্ত লাঠি। গোপী বললে, লাঠির মাথায় খোঁচা লাগানো আছে, বিঁধে ফেলাব যদি এগুবি তো, হ্যাঁ।

অন্ধকারের মধ্যে ভয়াল মনে হচ্ছে গোপীকে। ওরা দুজনে কয়েক পা পিছু হ'টে এল।

গোপী হেসে বললে, তুদের মত অনেক দেখলম আমি। পালা। পালা।

বিড়িওয়ালা অমূল্যকে বললে, আয়। কাল দেখব। আজ সব নোংরা হয়ে আছে। আয়।

*   *   *

পরের দিন সন্ধ্যার পর নয়, দুপুরবেলাতেই অমূল্য এল। সে আর দেরি সইতে পারলে না। কোমরে একটা ছুরি নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু শেল্টার শূন্য! কেউ নেই। গুপে তার বুবিকে নিয়ে খোকাকে নিয়ে অন্যত্র চ'লে গেছে।

অমূল্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই তার মনে পড়ল, আজ সংক্রান্তি, কাল নতুন খাতা। মালিককে হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

বোবা কান্না

"চৈতে কুয়া, ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।"—খনার বচনে আছে। তেরো শো পঞ্চাশ সালের কার্ত্তিক মাস, লোকে ওই কথাটা নিয়েই আলোচনা করে প্রায় সারাদিন। গত চৈত্র মাসে কুয়াশা হয়েছিল কি না—এ কথায় কেউ বলে, ওরেঃ বাপ রে! একেবারে কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মত চারদিক ঢেকে গিয়েছিল; মনে নাই? কেউ বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কেউ ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা ক'রে মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ ঘাড় নাড়ে, যার অর্থ—হ্যাঁ অথবা না দুই হতে পারে। কেউ বলে, উহু, নাঃ। তা ছাড়া চৈত্রে কুয়াশার সঙ্গে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার সম্বন্ধটা যে কোথায়, তা ঠিক ধরাও যায় না।

মিহির মুখুজ্জের কাঁচা বয়েস. তাজা রক্ত, তার উপর ডাক্তার মানুষ, সে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলে, যে দেশে আকাশে অমাবস্যে লাগলে পায়ে বাত টাটায়, সেই দেশেই চৈতে কুয়াশা হ'লে আট মাস পরে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায়। মধ্যে মধ্যে চ'টেও ওঠে, বলে, মা চণ্ডী আছেন, শনি-সত্যনারায়ণ আছেন, বিপত্তারিণী আছেন তোমাদের, তাদের কাছে যাও না। রাত-দুপুরে আমায় জ্বালাতে এস কেন? চরণোদক খাওয়াওগে রুগীকে, ওষুধ দেব না আমি। যা তোদের ওই চণ্ডীমায়ের পাণ্ডা ভটচাযের কাছে; যা, ভাগ্ ভাগ্ এখান থেকে।

মিহির ডাক্তারের ভয়ানক রাগ ওই ভট্টাচার্য্যের উপর। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য—চণ্ডীমায়ের পূজক, প্রবীণ মানুষ, অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আচারে আচরণে এতটুকু ফাঁকি নাই, চণ্ডীমায়ের সেবা করেন প্রাণ ঢেলে, চোখ বুজে ধ্যান করতে ব'সে চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মায়ের নাম করতে আবেগে প্রৌঢ়ের ঠোঁট দুটি কাঁপে। লোকে

বলে, গভীর রাত্রে নির্জ্জনে মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যের কথাবার্ত্তা হয়। পাথরের মূর্ত্তি থেকে মা নাকি বেরিয়ে এসে ভট্টাচার্য্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। অদ্ভুত স্বাস্থ্য তাঁর—আজও পর্য্যন্ত কখনও ওষুধ খান নাই! কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—গায়ে কখনও জামা কি চাদর কিংবা আলোয়ান কিছু দেন না, মাথায় ছাতা নেন না, পায়ে জুতোর কথা এর পর বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ গাঁয়ের লোক—যারা অপর জায়গায় গিয়ে ভট্টাচার্য্যর গল্প করে—তারা অন্তত প্রয়োজন করে না। ভট্টাচার্য্য হাসেন ডাক্তারের কথা শুনে। বলেন, উইপোকার পক্ষোদ্গমের আস্ফালন। দুজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা লড়াই চ'লে আসছে।

এই ঝগড়া চ'লে আসছে নেপথ্য দ্বন্দ্বের মত। দু-চারবার মুখো-মুখি ঝগড়াও হয়েছে। সেবার হঠাৎ একদিন মিহির ডাক্তারকে ডাকতে এল ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যের ছেলে। তার ছেলের অর্থাৎ ভট্টাচার্য্যর নাতির জর হয়েছে; সাত দিন কেটে গেছে, কিন্তু জ্বর কোনক্রমেই বাগ মানে নাই, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে—পেটে বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর একবারের জায়গায় দিনে দুবার বাড়ছে, প্রবল জ্বরের সময় দু-চারটে ভুলও বকছে রোগী। ভট্টাচার্য্যের ছেলে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধ'রে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, খোকাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে একটু রহস্য করবে কি না; কিন্তু অকস্মাৎ ভট্টাচার্য্যের ছেলের কাকুতিতে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চমকে গেল। ভদ্রলোকের দু চোখের কোণ থেকে জলের দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে দরদী পরমাত্মীয়ের মত বললে, এ কি। তার জন্যে আপনি কাঁদছেন কেন? জ্বর আর কার না হয়! চলুন, এখুনি আমি যাচ্ছি, ভয় কি? আমি বলছি, ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্য্যের ছেলের নাম গিরিজা; গিরিজা চোখের জল মুছে

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বাবা বলছেন ডাক্তারবাবু—। আর সে বলতে পারলে না, বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে উঠে তার গলার ভিতরটা যেন চেপে ধরলে, শুধু ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, ঝ'ড়ো হাওয়ার তাড়নায় অশ্বত্থের পাতার মত!

কি বলছেন আপনার বাবা?—রাগে বিরক্তিতে ডাক্তারের কপালের মসৃণ চামড়া কুঁচকে উঠল, গলার স্বর রূঢ় হয়ে উঠল।

অনেক কষ্টে গিরিজা আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, বাবা বলছেন, ডাক্তার ডাকবি ডাক্, কিন্তু মায়ের ইচ্ছের ওপর কারু হাত নাই।

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বললে, মা তো পাথরের, তার আবার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কি?

গিরিজা শিউরে উঠল, কিন্তু প্রতিবাদ ক'রে ডাক্তারকে চটাতে সে সাহস করলে না।

মায়ের ইচ্ছার কথা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য নিজেই বললেন ডাক্তারকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে ডাক্তারি চিন্তিত মুখেই বাইরে এসে কল-বক্স থেকে ওষুধ বের ক'রে নিজে হাতে মিকশ্চার তৈরি ক'রে দিলে, ইনজেকশন দিলে, একখানা কাগজে যথাসম্ভব সরল ভাষায় কখন কি করতে হবে লিখে দিলে! এতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য একটি কথাও বলেন নাই। এবার অদ্ভুত একটু হাসি হেসে বললেন, দেখলেন?

দেখলাম? টাইফয়েড। দেখাতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য নীরবে আবার একটু হাসলেন।

ডাক্তার বললে, রোগ অনেকটা বেড়ে গেছে। তা যাক। ভয় নেই, সেরে যাবে।

ভট্টাচার্য্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থ তার সুস্পষ্ট।

ডাক্তার এবার ফেটে পড়ল। বললে, আপনি কি মানুষ?

ভট্টাচার্য্য বললেন, মানুষ বড় অসহায় ডাক্তারবাবু, তার কোন হাত নাই।

কি বলছেন আপনি?

ও ছেলে বাঁচবে না।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভট্টাচার্য্য বললেন, সে কথা গিরিজাকে আমি বলেছি। তবে বাপের মন, যা করতে চায় করুক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু—। কথা অসমাপ্ত রেখে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য আবার হাসলেন।

ডাক্তার অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কঠিন কণ্ঠে বললে, আপনি এসব বলবেন না ওঁদের কাছে। ওঁরা নার্ভাস হ'লে সেবা-যত্ন ঠিকমত হবে না, রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হবে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য বললেন, মা আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ডাক্তারবাবু, ও রোগ সহজও নয়, কঠিনও নয়, ও রোগ মৃত্যু-রোগ।

শুধু একদিন নয়, আটাশ দিন পর্য্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলল; এই আটাশ দিনের প্রথম সাত দিন বাদ দিয়ে একুশ দিনই ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য ওই একই কথা বলেছেন, একই হাসি হেসেছেন, একই স্থির শান্ত ভাবে বাইরের দাওয়াটির উপর ব'সে ডাক্তারের রোগী দেখে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করেছেন। ডাক্তারেরও যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, সে ফীয়ের কথা বলে নাই, ওষুধের দামের হিসাব রাখে নাই, নিজে থেকে প্রত্যহ দুবার ক'রে নিয়মিত রোগী দেখেছে, দরকার বুঝলে রাত্রে পর্য্যন্ত থেকেছে; আঠারো দিনের রাত্রে, একুশ দিনের রাত্রে, আটাশ দিনের রাত্রে—সে সমস্ত রাত্রি রোগীর বিছানার পাশে ঠায় জেগে ব'সে থেকেছে। আটাশ দিনের রাত্রে, তিনটার পর মিহির বেরিয়ে এল রোগীর ঘর থেকে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য দাওয়ার উপর বসে ছিলেন, ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বললেন, তারা মা! তারপর সুস্পষ্ট একটা গভীর

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

ডাক্তার রূঢ় স্বরে বললে, না। আপনার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আজকের ক্রাইসিস কেটে গেছে।

ভট্টাচার্য্য আজ চমকে উঠলেন।

ডাক্তার বললে, কাল থেকে রোগীর অবস্থা ভালর দিকেই চলবে মনে হচ্ছে। সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা হ'ল না, ছেলেটি এর পর ধীরে ধীরে সেরেই উঠল। পঁয়তাল্লিশ দিনের পর সে অন্নপথ্য করলে।

আরও একবার হয়েছিল এমনই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

গ্রামের ধনী জমিদারের মাতৃহীন দৌহিত্র, মাতামহ-মাতামহীর যাকে বলে চক্ষের মণি; দুরন্ত ছেলে চুরি ক'রে একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; তারপর ক্রমশ প্রচণ্ড আক্ষেপের সঙ্গে ধনুকের মত বেঁকতে আরম্ভ করলে। মিহির ডাক্তার লক্ষণ দেখে অনেক অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলে, ঘোড়ার আস্তাবলে খেলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠে গেছে। কথাটা অনেক দিনের। তখন গত মহাযুদ্ধের আমল, ওষুধ এ দেশে তখন তেমন তৈরী হ'ত না, ভারত মহাসাগরের 'এমডেনের' দৌরাত্ম্যে বিদেশ থেকেও মাল আসত না; মিহির ডাক্তারের যে ওষুধটির দরকার ছিল, সে কোনক্রমেই পাওয়া গেল না। বড় লোকের বাড়ি, মিহির ডাক্তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে স্পষ্টই বললে, ওষুধ নেই, আমার কোন হাত নেই।

ওষুধের অভাবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এলেন; দেবমন্দিরে পূজা গেল, স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হ'ল। কলকাতার ডাক্তার মিহির ডাক্তারের কথাই সমর্থন করলেন, কোন আশা নেই।

মতামহী মার্বেল পাথরের মেঝের উপর মাথা কুটতে আরম্ভ

করলেন ; তাঁর সে বুকফাটা কান্নায় বাড়িটা ভ'রে গেল শ্বাসরোধী শোকের আবেগ। ছেলেটি বিছানার উপর প'ড়ে আছে—নিথর নিস্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে ব'লে পাঁজরের উপরটা শুধু নড়ছে ; মধ্যে মধ্যে এক-একটা আক্ষেপ আসছে, আর সমস্ত লোক শ্বাস রুদ্ধ ক'রে স্থির দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকছে—হয়তো হঠাৎ এখুনি সব স্থির হয়ে যাবে।

বাইরের ঘরে শেষকৃত্যের সমস্ত আয়োজন সংগৃহীত হ'ল। হাঁড়ি, কুঁচি, কাঁড়, সোনা, রূপো, শববহনের খাট এবং আরও অনেক জিনিস। জনচারেক মজুর সন্ধ্যার পর শবদাহের কাঠ কাটতে আরম্ভ করলে।

এই সময় ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য এলেন। তিনি এসেছিলেন চণ্ডীমায়ের স্থানে ছেলের কল্যাণ-কামনায় যে পূজা করেছিলেন, সেই পূজার নির্ম্মাল্য এবং দেবীর চরণোদক নিয়ে। ছেলের মাতামহী তাঁকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মা আমার এই করলেন ?

পরিবারটির সত্যই প্রগাঢ় দেবভক্তি, বিশেষ ক'রে ওই মাতামহীটির।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য নির্ম্মাল্য এবং চরণোদক নিয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, ভয় কি মা ? ছেলে বাঁচবে, মা আমাকে বলেছেন।

মিহির ডাক্তার বাইরে ব'সে ছিল, সে একটু হাসলে। হেসে সে উঠল। বললে, থেকে কোন লাভ নেই। শরীরও খারাপ হয়েছে আমার। আমি বাড়ি যাই।

বাড়ির কর্ত্তা তবু ছাড়লেন না। বাইরে নিরিবিলি বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, বললেন, বাড়িতেও ঘুমুবেন, এখানেও ঘুমুবেন। আমি ডবল ফী দেব।

মিহির ডাক্তার একটু ভেবে বললে, আমি থাকছি, কিন্তু আজ কোন ফী দিলে আমি নেব না।—এই শর্ত্তে থাকছি আমি ;

রাত্রি তিনটের সময় তাঁর ঘরে ঘা দিয়ে কম্পাউণ্ডার ডাকলে,

ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! ডাক্তার বিরক্ত হয়েই উঠল। কি করবে সে? কি করবার আছে?

কম্পাউণ্ডার বললে, আসুন একবার। রোগীর জ্ঞান হয়েছে, চোখ মেলে তাকাচ্ছে, কথা বলছে, চোয়াল ছেড়ে গেছে।

জ্ঞান হয়েছে? চোখ মেলে তাকাচ্ছে? চোয়াল ছেড়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই চরণামৃত দিচ্ছিলুম মধ্যে মধ্যে।

চরণামৃত? সিঁদুর-তেল-বাতাসা-গোলা জল?

কম্পাউণ্ডার আমতা আমতা ক'রে বললে, আজ্ঞে, রাণীমা বললেন, ওষুধ যখন যাচ্ছে না, ডাক্তারেরা যখন হাল ছেড়েছে তখন মধ্যে মধ্যে মায়ের চরণামৃত ছাড়া আর কিছু দিও না, তাই—। সে অপরাধীর মতই চুপ ক'রে গেল।

অসহিষ্ণু ডাক্তার বললে, তারপর?

সবই কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, একবার বিরক্ত হয়েই মশাই, সত্যি বলছি আপনাকে, একটু বেশি ক'রে চরণামৃত দিলাম কষ ফাঁক ক'রে। গলা দিয়ে খানিকটা গেল! একটা হেঁচকি উঠল। আমি ভাবলাম, হ'ল এইবার, বুকে লাগল জল। ঠিক তারপরেই ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, দিদিমা!

ডাক্তার এসে রোগীর পাশে বসল। সত্যই রোগী চোখ মেলে চেয়েছে। ডাক্তার সর্ব্বাগ্রে তাকে একটু গরম দুধ দেবার ব্যবস্থা করলে। দুধ খেয়ে ছেলেটা কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে, আমার সন্দেশ! আমার সন্দেশ কি হ'ল! আমি সন্দেশ খাব। চেতনা হারাবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সে যে সন্দেশ চুরি করেছিল, সেই সন্দেশের কথা মনে পড়েছে তার। সমস্ত বাড়ির লোক হেসে উঠল।

প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই বাইরে শোনা গেল ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠস্বর। সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তুমি যা করাও মা; তাই করি, লোকে বলে করি আমি। ঘরে ঢুকে

সমস্ত শুনে তিনি বললেন, দাও, ওকে সন্দেশই খেতে দাও, মায়ের পূজোর থালায় প্রসাদী মিষ্টি আছে দেখ, তাই এনে দাও।

ডাক্তার উঠে পড়ল। ষ্টেথোস্কোপটা গুটিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কেউ বললে না, ডাক্তারবাবু, যাবেন না।

মিহির ডাক্তার অবিশ্বাস করলেও ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য চৈতে কুয়াশার ফলে নরমুণ্ড গড়াগাড়ি যাওয়ার প্রবচনে অবিশ্বাস করেন না। বলেন ক্রোধের পূর্ব্বে কালের ভ্রূকুটি ওটা। কিন্তু তিনিও ঠিক স্মরণ করতে পারেন না, সেই ঘন কুয়াশাটা চৈত্র মাসে হয়েছিল কি না। তবে নরমুণ্ড যখন গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন হয়তো—! ভট্টাচার্য্য ভাবেন, চৈত্রে কুয়াশা হ'লে তো সেই সময়েই তিনি এই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের চেষ্টা করতেন; মায়ের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করতেন অসহায় মানুষের জন্য। মা যে মহাকালী, ভ্রূকুটিকুটিল মহাকালের সম্মুখে তিনি যদি মোহিনী বেশে দাঁড়াতেন, তবে মহাকালের ভ্রূকুটি যে মিলিয়ে যেত. প্রসন্নতায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত বৃষভবাহন বরবেশী শিবের মত।

*　　　*　　　*

চৈত্রে কুয়াশা নিয়ে মতদ্বৈধ যতই থাক, ভাদ্রে বন্যার কথা কথা নয়, কাহিনী নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব। দামোদর, অজয়, কোপাই, বক্রেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, গঙ্গায় যে ভীষণ বন্যা হয়ে গেল, শ্রাবণে আরম্ভ হয়ে ভাদ্র পর্য্যন্ত চারদিকে যে জলপ্লাবন ব'য়ে গেল, তার স্মৃতি এখনও মানুষের চোখের উপর ভাসছে। দামোদর-অজয়ের বাঁধ এখনও ভেঙে রয়েছে। ভাঙন দিয়ে এখনও জলস্রোত বইছে নদীর মত। সুজলা সুফলা 'আউয়ল' জমি দহ হয়ে গেছে; তার দুপাশে হাজার হাজার বিঘা জমির উপর বালি চেপে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ধু-ধু করছে। বালি এখন ভিজে রয়েছে, যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন বাতাসে বালি উড়বে হু-হু ক'রে; খাঁ-খাঁ করবে মরুভূমির মত। লক্ষ্মীর আসনকে বন্যার স্রোত

বোধ হয় চিরদিনের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ; ধানের চাষ আর কোনদিন বোধ হয় হবে না এসব জমিতে। অন্তত দু পুরুষের কালে আর নয়। বালি-চাপা জমিগুলোর মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত, গর্ত্তগুলায় জল জ'মে আছে। যত জল শুকিয়ে আসছে, তত সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ উঠছে। সকাল-সন্ধ্যেতে মানুষ গরু ও-পথে হাঁটলে পাগল হয়ে যায় ; মৌমাছির চাকে খোঁচা দিলে ঝাঁক বেঁধে যেমন মৌ-মাছির দল যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে, তেমনই ভাবে মশা এবং মাছির ঝাঁক মানুষ-গরুকে ছেঁকে ধ'রে মাথার চারপাশে ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। মাঠের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাগুলো ছিল, তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এত বড় বড় রাস্তা, বাদশাহী শড়ক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সে রাস্তা পর্যন্ত ভেঙে-চুরে খোয়া ইট পাটকেল পাথর সমস্ত উপড়ে দিয়ে কাল্‌ভার্ট ভেঙে একেবারে 'জাগুন গাঁড়' অর্থাৎ পঙ্কক্ষেত্র ক'রে দিয়ে গেছে। রাস্তা ছোট কথা, রেল-কোম্পানির এমন মজবুত লাইনের বাঁধ, সে পর্য্যন্ত ভেঙে ধুয়ে নিয়ে গেছে ; বোল্ট-নাটে আঁটা লোহার লাইনে বেঁকে কোথাও ভেঙে গেছে, কোথাও ঝুলছে ত্রিশঙ্কুর মত। একটা ব্রাঞ্চ লাইনের মাঝারি আকারের একটা ব্রিজের দশটা পিলারের মধ্যে তিনটে পিলারের গোড়ায় মাটি এমন খুলে গেছে যে, সেখানে জলের গভীরতা পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট, একটা পিলার মুচড়ে ভেঙে দুখানা হয়ে গেছে। এখনও অবশ্য উপরের রেললাইনের ভারে এবং লাইনের বাঁধনের টানে কোনমতে ত্রিভঙ্গ-মুরারির মত দাঁড়িয়ে আছে সেটা, এবং রেল-কোম্পানি সেটাকে মোটা রশা ও তারের রশি দিয়ে বেঁধেছে চারপাশে, বড় বড় মজবুত শালের ঠেকাও দিয়েছে। সেটার উপর দিয়েই পিঁপড়ের মত সুড়সুড় ক'রে এখন ট্রেন পার হয়! প্যাসেঞ্জারদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ; হঠাৎ কেউ হয়তো ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠে, হরিবোল! সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনির রোল উঠে যায়। মুসলমানেরা এসব অঞ্চলে সংখ্যায় কম। তাদের কখনও ধ্বনি তুলতে শোনা যায়

না, কিন্তু উৎকণ্ঠায় সমান স্থির হয়ে ব'সে থাকে। মিহির ডাক্তারও মধ্যে মধ্যে যায় আসে এই পথে। সে জানে, বহুদর্শী বিচক্ষণ এঞ্জিনীয়ার বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে অনেক বিবেচনার পর নিরাপত্তার বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তবে ট্রেন চলাচল করতে দিয়েছে, তবুও তার হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায় এই সময়টায়। সেও অপরাপর যাত্রীদের মত স্থির আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যও মধ্যে মধ্যে যান এই পথে গঙ্গাস্নানে; নিয়তিরহস্যকে তিনি—রসসাহিত্যকে রসিকজনের গ্রহণ করার মত—নির্ব্বিকারভাবে গ্রহণ করেছেন বা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন, তিনি পর্য্যন্ত এই সময়ে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে ব'সে থাকেন, হৃদ্‌স্পন্দন তাঁরও বাড়ে।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ধ্বংসলীলা বাদেও যে কোন স্থানের মাটিতে পা দিলেই মনে পড়ে ভাদ্রের বন্যার কথা। মাটি এখনও ভিজে, রাত্রি একটু গাঢ় হ'লেই মাটিতে পা দিলে মনে হয়, স্যাঁতস্যাঁতে নদীকূল দিয়ে চলেছি। মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যের গ্রাম ফুল্লরাপুর সে এমন শুকনো খটখটে গ্রাম, যে গ্রাম সম্বন্ধে লোকে চিরকাল ব'লে আসছে 'দুনিয়া ডুবলে এক হাঁটু জল', সে গ্রামে পর্য্যন্ত এবার বানের জলের ঠেলা এসে পৌঁছেছিল। গ্রামের মাটি পর্য্যন্ত এখনও শুকোয় নাই। কার্ত্তিক মাসে সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা অবশ্য চিরকালই পড়ে, কোন কোন বার ভোর-রাত্রে গায়ে কাপড়ও দিতে হয়, এবার কিন্তু কার্ত্তিকের প্রথমেই লেপ পাড়তে হয়েছে, সন্ধ্যার পর থেকেই মেঝেতে পর্য্যন্ত যেন হিম উঠে। ভাদ্রের বন্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং সেই বন্যার ফলে যে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবে বা যাচ্ছে, তাতেও কারও কোন মতদ্বৈধ নাই। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যেরও না, মিহির ডাক্তারেরও না। তবু কিন্তু দুজনের মনের বিরোধ মেটে নাই। ভট্টাচার্য্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

মিহির ডাক্তার নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় হেসে বলে, অতএব তোমরা মায়ের রুষ্ট ইচ্ছাকে তুষ্ট করবার জন্যে পূজো দাও, মানত কর, প্রণামী দাও। —ব'লে বক্রহাসি হেসে স্পিরিটে ভেজানো তুলো দিয়ে ইঞ্জেক্‌টিং সিরিঞ্জের সূচটা মুছে নেয়, তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সামান্য এক টুকরো ওই তুলো জ্বালিয়ে সূচটাকে পরিশোধন ক'রে নেয়।

ডাক্তারখানার বাইরের দাওয়ায় ব'সে শশী ডোম বলে, ডাক্তাবাবু!

কে? শশী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি? কুইনিন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রোগীতে কুইনিন পাচ্ছে না, তোকে কোত্থেকে দেব রে?

শশী বললে, আজ্ঞে, তা হ'লে যে আমি ম'রে যাব বাবু, রোগ ধরলে—। শশী চুপ ক'রে যায়। ডাক্তার একটু হাসে। বলে কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই ধান-চালের বাজার, তার ওপর তোর আবার রাত্রের কাজ! কি রে? ডাক্তার এবার হা-হা ক'রে হাসে।

শশী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ ক'রে থাকে। সেও মুচকে মুচকে হাসে, এবং সে হাসিটুকু অপরের কাছে লুকাবার জন্যই সে মুখ নামায়।

॥ দুই ॥

শশী ডোম এ অঞ্চলে সর্ব্বজনপরিচিত ব্যক্তি। সরকারী মহল থেকে ভিখিরী-নিকিরি, এমন কি এখানকার কুকুরগুলা পর্যন্ত তাকে চেনে। সে হিসেবে শশীর খ্যাতিকে অস্বীকার করা চলে না, তবে বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত শশী এখানকার পাকা দাগী চোর। শশী ম্যালেরিয়ার সময়টায় কুইনিন খায়। শুধু এবার নরমুণ্ড গড়া-গড়ি যাবার বছরেই নয়, বরাবরই সে খায়। 'কার্ত্তিকের সাত অঘ্রাণের আট, ভাতার পুতকে যতনে রাখ্, হাঁড়ি তুলে শুধাবি ভাত।' এ সময়টায় পেট পুরে খেতে দিতে পর্য্যন্ত বারণ আছে। শশী সেও পালন করে। কুইনিন খাওয়ার উপকারিতা সে বুঝে এসেছে জেলে। সে অনেক দিন আগে, শশীর তখন কাঁচা বয়েস, জেল বোধ হয় দ্বিতীয় বারের জেল, বর্দ্ধমান জেলে কয়েদীদের মধ্যে কম্পজ্বর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সপ্তাহে দু দিন কি তিন দিন কয়েদীদের ফাইলবন্দী অর্থাৎ সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে জেল-ডাক্তার প্রত্যেকের হাতে দিত এক-একটা কুইনিনের বড়ি; তারপর জমাদার হাঁকত, স--র—কা—র—

কয়েদীরা সেলাম দিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিত কুইনিনের বড়ি। এর ফলে শশী ওই কম্পজ্বরের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেও মহাবীরের মত অকম্পিত শরীরে দিন দিন উত্তরোত্তর শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে-ছিল; সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল 'কুনিয়ানে'র উপকারিতা। অবশ্য আরও একটা বল তার ছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যের দেওয়া মা-চণ্ডীর আশীর্ব্বাদী দিয়ে তৈরি করা মাদুলি। 'কুনিয়ান' খাওয়ার সঙ্গে মাদুলিটা ধুয়েও সে নিয়মিত জল খেত। ডাক্তারেরা বলেন, ব্র্যাণ্ডি সহযোগে কুইনিনের কার্য্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর ধারণা ভট্টাচার্য্যের মাচণ্ডীর মাদুলি-ধোয়া জল সহযোগে ডাক্তারী 'কুনিয়ান'

অব্যর্থ। মালোয়ারির বাবারও সাধ্যি নাই যে, কাছে আসে। শশী তার সহচর-অনুচরদের বহুবার এ কথা বলেছে। কিন্তু তারা তেতো ব'লে আর কান ভোঁ-ভোঁ করে ব'লে 'কুনিয়ান' কিছুতেই বরদাস্ত ক'রে উঠতে পারে না।

শশী মিহির ডাক্তারের দোকান থেকে ম্যালেরিয়ার সময় নিয়মিত কুইনিন কিনে খায়; চণ্ডীতলায় যায়, কোনদিন ছুটা কলা, কোনদিন ছুটা শশা, কোনদিন বা গণ্ডাখানেক উচ্ছে মায়ের উঠনে ঢেলে দিয়ে প্রণাম করে, ভট্টাচার্য্য মশাইকে বলে, একটুকুন চন্নামেত্য দেবেন বাবা।

ভট্টাচার্য্য প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, শশীর হাতে চরণামৃত দিয়ে বলেন, তোর ভক্তি তো অগাধ রে শশী, কিন্তু মা তোকে সুমতি কেন দেন না, সেইটে বুঝি না।

শশী চরণামৃতটুকু সুপ ক'রে মুখে টেনে নিয়ে হাতখানি মাথায় বুলাতে বুলাতে দাঁত মেলে হাসে।

মিহির ডাক্তারের কুইনিন এবং ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের চরণামৃতের বলে বলীয়ান হয়ে সে গভীর রাত্রে বর্ষার ঝিপি-ঝিপি জলে ভিজে, হিমেল বাতাস গায়ে লাগিয়ে চুরি ক'রে বেড়ায়।

মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য দুজনেরই উপর সমান ভক্তিমান শশী। ডাক্তার এবং ভট্টাচার্য্য দুজনেই এই নিষ্ঠার জন্য চোর শশীকে না ভালবেসে পারেন না।

ডাক্তারের কথা শুনে শশী একটু চিন্তিত হ'ল। ডাক্তার বললেন, সত্যিই কুইনিন আজ পাবি না। শশীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'কুনিয়ান' পাওয়া যাবে না?

দূরে আকাশে কোথায় গোঁ-গোঁ শব্দ উঠেছে। রাস্তার লোকজন মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলার হাড়-পাঁজরাসার অবস্থা; কেউ দু দিন, কেউবা চার দিন মাত্র জ্বর থেকে

উঠেছে, এই অবস্থাতেও সব ছুটে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। উড়ো-জাহাজ। উড়ো জাহাজ!

শশী একবার আকাশের দিকে তাকালে, উড়ো-জাহাজটা এখনও নজরে পড়ার মত কাছে আসে নাই, দেখা যাচ্ছে না। দেখতেও ইচ্ছে হয় না। এক তো দেখে দেখে অরুচি ধরেছে প্রায়। সকাল থেকে রাত্রি ছু পহর তিন পহর পর্য্যন্ত ওগুলোর যাওয়া-আসার বিরাম নাই; গোঙাতে গোঙাতে যাচ্ছে আসছে, আসছে যাচ্ছে। কখনও একখানা কখনও ছুখানা, চারখানা, একসঙ্গে মধ্যে মধ্যে আবার দশ-বিশখানা—পাখীর দলের মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। তার উপর, ওগুলার উপর শশীর ভয়ানক রাগ। তার ধারণা, ওই-গুলার ধাক্কা লাগাতেই এবার বর্ষার মেঘ ছিঁড়েখুঁটে গিয়ে এমন ধারার সর্ব্বনাশা জল ঢেলেছে, তাতেই ভাদ্রে এমন প্রলয়-বান হয়েছিল।

ওগুলা নাকি যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধ! কথাটা মনে ক'রে শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এখানকার লোকে বলে, কাল-যুদ্ধ! ত্রিশ টাকা, পঁয়ত্রিশ টাকা মণ চাল! দশ টাকা বিশটাকা জোড়া কাপড়, চিনি নাই, কেরোসিন তেল আনতে হয় ইউনিয়ন বোর্ডের টিকিট দেখিয়ে, সাগুর সের চারটাকা, ওসব দূরের কথা, ভাঙা দরজা মেরামত করবার জন্য একটা পেরেকের দরকার হয়েছিল শশীর, একটা পেরেকের দাম নিয়েছে চার পয়সা!

শশী দোকানীর উপর ভয়ানক চ'টে গিয়েছিল, একটা পেরেকের দাম চার পয়সা?

দোকানী হেসে বলেছিল, এর পরে চার আনা দিলেও আর পাবি না।

পেরেকটা নিয়ে আমার বুকে ঠুকে বসিয়ে দাও, আরও চারটে পয়সা দেব—ব'লে রাগ ক'রে শশী একটা আনি ফেলে দিয়ে পেরেকটা নিয়ে এসেছিল, এবং সেই দিন রাত্রে দোকানীর গোলা থেকে ছুটি বস্তা ধান চুরি ক'রে এর শোধ দিয়েছিল। শোধ বলা চলে না, সাজা

দিয়েছিল বলতে হয়; কারণ দুটা বস্তায় অন্তত এক মণ হিসেবে দু মণ ধানের দাম আঠারো টাকা দরে ছত্রিশ টাকা। শশী অবশ্য পেয়েছে পনেরো টাকা। চার পয়সার বদলে পনরো টাকা—নরুনের বদলে নাকের চেয়েও বেশি।

ধান-চালের দরের দিক দিয়ে হিসাব করলে শশীর এখন চরম সুসময়, এবং সত্যিই শশীর আর্থিক অবস্থা এখন ভাল। মধ্যে তার স্ত্রী একদিন একখানা পাঁচ টাকার নোট এক টাকার নোট ভ্রম ক'রে হাটে বাজার করতে বের করেছিল, খোদ দারোগা হাটে ছিল, সে পর্য্যন্ত দেখেছে। কিন্তু তবু শশী ধান-চালের এই বাজারের জন্য হায়-হায় করে। বৈশাখের শেষ থেকে ধান-চালের অভাবে মানুষের সে হাহাকার, না খেতে পেয়ে মানুষের মরণের কথা মনে হ'লে আজও শশী মদের মুখে বলে, ভগবান, কানে কালা ক'রে দাও, চোখে কানা ক'রে দাও। না হয়তো একবারে জানে মেরে দাও বাবা।

নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার সেই গৌরচন্দ্রিকা, অর্থাৎ আরম্ভ। আষাঢ়-শ্রাবণে লোকে খেতে পেলে না, তারপর ভাদ্রে হ'ল বান।

আকালের পর বান, বানের পর মড়ক। নরমুণ্ড গড়াগড়ি কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, সত্য সত্যই গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রামে কাক নাই, কুকুর নাই, অন্নহীন গ্রাম থেকে নরমাংস লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে। গ্রামের পুর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শ্মশান, ও-দিকটার আকাশে প্রায় অহরহই শকুনের পাল পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে দেখা যায়। শরীর শিউরে উঠে। শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেলে পাঁচটা দশটা মড়ার মাথা বাঁশ দিয়ে গড়িয়ে নদীতে না ফেলে চিতা সাজানো যায় না।

শশী সেদিন তার জ্ঞাতি-ভাইকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিল। কাঁচা বয়স, শূর বীরের মত চেহারা, বুকের ছাতিখানা দেখে মনে হ'ত যেন পাকা তালগাছের গোড়া। আকালের বাজারে খেতে না পেয়ে হাড়-পাঁচরা বেরিয়ে হয়েছিল যেন শুকনো খেজুরগাছ। তারপর ধরল

জ্বরে, জ্বরের পরই হাত-পা ফুলতে শুরু হ'ল। দিন পনরো পর ঘরের চালের ফুটায় তালপাতা দিয়ে ঢাকতে উঠে হঠাৎ 'কি হ'ল, ব'লে চাল থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই কাটা গাছের মত মাটির উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল। তাকে পোড়াতে গিয়ে শশী খানিকটা দূরে বসল। শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারদিকে মড়ার মাথা আর হাড়। ভাইপোর চিতা সাজাতে চার-চারটা মড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলতে হ'ল নদীর জলে। হরন্দ অর্থাৎ হরেন্দ চিতা সাজাচ্ছিল, সেই বললে, উটা তাঁতী-বউয়ের মাথা, উইটা হ'ল ঘোষেদের ছোটকার আর উইটা লাগছে যেন মিচ্ছিরীদের ঝিউড়ী মেয়েটার।

হবে। তার আর আশ্চর্য্য কি! হরেন্দ এ বাজারে মড়া পোড়াবার কাঠ কেটে দেওয়ার কাজ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় প্রতি মড়ার সঙ্গেই সে শ্মশানে আসে।

একজন বলেছিল, বাকিগুলান?

হরেন্দ্র এবার চুপ ক'রে গিয়েছিল। চারিদিকেই মড়ার মাথা, চোখ-নাকে গহ্বর, দু পাটি প্রকট দাঁত বের করে সমস্ত মাথাগুলো একই রকম বীভৎস চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে; জোর বাতাস দিলে গড়িয়ে কোনটা কার জায়গায় গিয়ে ঠেকে, কে তার হিসাব রাখে? মড়ার মাথার আশ্চর্য্য কিছু নাই, কেবল মরণ হয়েছে আশ্চর্য্যের। প্রথমে জ্বর, তারপর হাত পা মুখ ফোলা, তারপর হঠাৎ কারও কারও হচ্ছে কলেরার মত ভেদবমি, তাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারও আর একটা পাল্টা জ্বর; অধিকাংশ লোকের কিন্তু মরণ আচম্বিতে, ভেদ-বমি জ্বর ওসব কিছুই না, আচম্বিতে মরছে। যে মরছে, সেও জানতে পারছে না, অন্য লোকেও বুঝতে পারছে না, কখন কি হ'ল!

শশী সেদিন অনেক ভেবে-চিন্তে বলেছিল, ভাদর মাসে পাকা তাল পড়ছে যেন! শশীর উপমাটি হাস্যকর অথবা গ্রাম্য হ'লেও যারা ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়া দেখেছে, তাদের কাছে ওর মূল্য আছে।

তাঁতি-বউয়ের মাথার কথা হরেন্দ্র বলছিল। তাঁতী-বউয়ের জ্বর হয়ে হাত পা ফুলেছিল, সামান্য, বেশি নয়। সেদিন সে সকালে উঠেছে, ঘরের কাজকর্ম্ম করেছে, হাট-বার ছিল, স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছে, বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছে, হিন্দুস্থানী আমসত্ত্ব-আচার-ওয়ালারা যদি আসে, তবে একটুকুন আমসত্ত্ব নিয়ে এস। দাসা অর্থাৎ তন্তুবায় মশাই হাট থেকে ফিরে এসে দেখে, দাওয়ার উপর আয়না চিরুনি, সিঁদুর-কৌটো তেলের বাটি রেখে বউ শুয়ে আছে পাশেই! শুয়ে নয়, সরে পড়ে আছে।

দত্তদের সেজো দত্ত রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে সকালে আর উঠল না। দিব্যি ঘুমন্তের মতই শুয়ে আছে, দেহ কাঠের মত শক্ত, বরফের মত ঠাণ্ডা, মুখের পাশে খানিকটা গেঁজলা জমে আছে, আর তারই চারিপাশে লেগেছে অজস্র কাঠপিঁপড়ে।

মিছরী মানে মিশ্র-বাড়ির আট-দশজন লোকের মধ্যে থাকল শুধু দেড়জন—একটা বড় আর ছোট একটা ছেলে, সেটাকে ধরতে হ'লে আধখানার বেশি ধরা চলে না। আট-দশজনের মরণ ঠিক ওই ভাদ্র মাসের পাকা তাল পড়ার মত। মাস খানেকের মধ্যে বাড়িটা ফাঁক হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের বড় ভাই গাঁজা খেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফিকফিক ক'রে হাসছিল, একেবারে হঠাৎ একবার আঁ শব্দ ক'রেই চুপ ক'রে পড়ল মাটিতে মুখ গুঁজে। মেজো জন গিয়েছিল কুটুম্ব-বাড়ি। কালীপূজার দিন, বেচারা কুটুম্ব-বাড়ির পূজায় মাংস খাবার লেভে যাচ্ছিল। কি যে হয়েছিল, কেমন ভাবে যে মরল, সে কেউ দেখে নাই, তবে দেখা গেল, পথের ধারে একটা গাছতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মরে পড়ে আছে। ছোটজন অবশ্য মাসখানেক ভুগে মরেছে। ছোট জনকে পুড়িয়ে এসে শ্মশান-বন্ধুরা হাঁকলে, মুড়ি কই, নিমপাতা কই? এটুকুও ঠিক ক'রে রাখতে পার নি বাপু?

সামনের ঘরের দরজার সামনে একপাটি কপাটে মাথা রেখে

মিশ্রগিন্নী তিন সন্তানের শোকে কাতর হয়ে ব'সে ছিল। উত্তর দিতে পারলে না সে।

রূঢ়স্বরে শ্মশান-বন্ধুদের একজন বললে, আমরা তোমাদের চাকর নই। আমাদেরও মরণের ভয় আছে। ছেলে মরেছে, শোক হয়েছে জানি, সইতে না পার, আমাদের মুড়ি-নিমপাতা দাও, দিয়ে বরং পার তো গলায় দড়ি দিও, জল আছে ডুবে মরো, যা খুশি ক'রো।

মিশ্রগিন্নী তবু নড়ল না। এবার একজন এগিয়ে এসে গা ঠেলে বললে, শুনছ গো! অ—! তার মুখের কথা সে শেষ করতে পারলে না, চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে, এ কি, এ যে—এ যে—! ততক্ষণে তার হাতের নাড়া যেটুকু পেয়েছিল, তারই ফলে মিশ্রগিন্নীর দেহ-খানা শক্ত কাঠের মত গড়িয়ে প'ড়ে গেল।

ক'দিন পরেই মরল মিশ্রদের ঝিউড়ী মেয়েটা। সেও মরে পড়ে ছিল, হাতের কাছে তেতুলের আচারের একটা পাতা, হাতে মুখে আচারের দাগ, বোধ হয় খেতে খেতেই মরেছে।

রজনী সরকারের বউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল, একটু তাড়াতাড়িই উঠছিল, হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় বুকে হাত দিয়ে ব'সে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল একেবারে নীচে।

মানুষের মরণের বৃত্তান্ত মনে করতে করতে শশীর হাত-পা যেন হিম হয়ে আসে। শরীর আনচান ক'রে ওঠে। শশী অস্থির হয়ে নিজেকে নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুইনিন না হ'লে তার চলবে কি ক'রে? জ্বর যদি হয়? তারপর যদি হাত-পা ফোলে? রাত্রে ধান-বোঝাই বস্তা মাথায় ক'রে চলবার সময় কি পথের উপর প'ড়ে ম'রে থাকবে?

কুনিয়ান আমার চাই ডাক্তারবাবু। দাম যা লেন, দোব আমি। কুনিয়ান আমার চাই।

শশীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গীতে ডাক্তার চমকে উঠল।

মিহির ডাক্তারও বড় রোখা লোক। সে অন্যায় চোখরাঙানি

কারও সহ্য করে না, সে রাজা-রাজড়াই হোক আর শেঠ-মহাজনই হোক কিংবা দারোগা-জমাদারই হোক। ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে বললে, না। তারপর আপনার কাজ করতে আরম্ভ করলে। একটু পর আবার বললে, যারা রোগে ভুগছে, তাদের না দিয়ে ও ওষুধ-তোকে দিতে পারব না। আর বেশি দাম নিয়ে ওষুধ আমি বেচি না।

শশী দমে গেল। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর এক উপায় আছে। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। সে দিতে পারে। বেশি দাম নেয় বলেই শশী আজও তার কাছে কুইনিন কেনে নাই। এইবার তাকেই ধরতে হবে। শশী রাস্তার উপর নেমে এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের সামনে কম্পাউণ্ডারকে কুইনিনের জন্য বলা যে উচিত নয়, এ জ্ঞান শশীর টনটনে। ডাক্তাবের পাশের ঘরে কম্পাউণ্ডার চিনে-মাটির সাদা খলটায় খটখট ক'রে ওষুধ মাড়ছে। এদিকে তাকালেই শশী স্নুট ক'রে তাকে ছুটি আঙুলের নাড়া দিয়ে ডাকবে।

কম্পাউণ্ডার তাকিয়েছে; শশী হাত তুললে, কিন্তু ডাকা হল না। সে, কম্পাউণ্ডার, ডাক্তার, অন্য রোগী যারা ছিল, তারা সবাই চকিত হয়ে উঠল। থানার সামনে রাস্তাটা যেখানে পশ্চিম মুখ থেকে বেঁকে একেবারে দক্ষিণ মুখ ফিরেছে, সেইখান থেকে রোল উঠল বল—হ—রি—, হরি—বো—ল!

কেউ গেল আর কি!

কে? ডাক্তার ভেবে দেখছিল, কে হতে পারে? কিন্তু ডাক্তারও ভেবে ঠিক করতে পারে না। চণ্ডীদাস দত্ত? হাফিজ সেখ? নিশী ময়রার পরিবার? মহাদেবের মা? আরও অনেক নাম মনে পড়ল। যে কেউ হতে পারে—যে কেউ। হঠাৎ মনে হল, হতে পারে না কেবল হাফিজ সেখ। ওটা তার ভুল হয়েছে। হরিবোল তুলে হাফিজের যাবার কথা নয়।

মরণের আশ্চর্য্য কিছু নাই, এ বাজারে বাঁচাই আশ্চর্য্য, কিন্তু

তবুও সবাই রাস্তার ওইদিইটায় চেয়ে রইল। শশীও চেয়ে রইল। চারটা লোক অতি কষ্টে মরা বয়ে আনছে; মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে দুটি মেয়ে—একটি বউমানুষ বলে মনে হচ্ছে। এতখানি ঘোমটা।

বল—হ—রি—

কে? কে মারা গেল? ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াল।

আনু—আনু—আনু ঠাকুর! ওই যে কেষ্টদীঘির পাড়ে থাকত।

আমার অনিরুদ্ধ, ডাক্তারবাবু, আমার সোনার অনিরুদ্ধ বাবা! চীৎকার ক'রে উঠল একটি প্রৌঢ়া বিধবা, অনিরুদ্ধের মা।—ওরে বাবা আনু রে—। বলে সে সেই পথের ধুলার উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে! কোলে একটি বছর দুয়েকের ছেলে! ছেলেটিকে জড়িয়ে বেরিয়ে আছে দুখানি হাত, আর মাটির উপর দেখা যাচ্ছে দুখানি পায়ের পাতা। সমস্ত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিবন্ধ হল আপনা থেকে; কাঁচা সোনার মত রঙ; কোমল লাবণ্য যেন ঝ'রে পড়ছে ওই হাত দুখানি থেকে। দুগাছি রঙ-চটা সাদা শাঁখা ছাড়া কোন গয়না ছিল না। কিন্তু ওতেই কি শোভা হয়েছে সে হাতের! আহা-হা!

শশীও চেয়ে দেখছিল ওই হাত দুখানি। আনুর মা বুক ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করছিল, কিন্তু সমস্ত লোকগুলি সকরুণ অন্তরে আক্ষেপ ক'রে ভাবছিল, ওই সোনার প্রতিমার মত মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা।

ডাক্তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

আঃ! হায়—হায়—হায়! মা! এ কি করলি মা? বক্তার কণ্ঠস্বর শুনে সকলে কিন্তু এবার সোনার প্রতিমার দিক থেকেও চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। পুজার ফুলের সাজি হাতে নিয়ে কখন সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য। তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে; চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসছে; বেদনাকাতর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন ওই বধূটির দিকে।

ভট্টাচার্য্যের চোখের জল দেখে অকস্মাৎ শশীর চোখ দুটিও করকর ক'রে উঠল। শশীও কেঁদে ফেললে। আঃ! হায়—হায়—হায়! হে ভগবান! কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল। আন্নু ঠাকুর মরেছে, তাতে তো তার কাঁদবার কথা নয়! শবটা বহন ক'রে তখন বাহকেরা খানিকটা এগিয়ে গেছে। শশী চোখের জল মুছে ফেললে। তার অন্তরের মধ্যে প্রতিশোধমূলক আক্রোশ জেগে উঠল! আন্নু ঠাকুর পুলিসের গুপ্তচর, সাক্ষাৎ শয়তান, বদমাস, পাজীর একশেষ ছিল আন্নু ঠাকুর। কিন্তু আন্নুর বউ এত সুন্দর! শশী আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

॥ তিন ॥

আন্নু ঠাকুর সত্যিই পুলিসের চর ছিল। এখানকার লোক সে নয়, পুলিসের দারোগাই তাকে এনে এখানে রেখেছিল। আন্নুর গ্রাম থেকে আন্নুর সমবয়সী জনকয়েক ছেলে ধরা পড়েছিল—একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলায়। আন্নুর সমবয়সী হ'লেও আন্নুর বন্ধু কোন কালেই তারা ছিল না। তারা ছিল কলেজের ছাত্র, আন্নু ছিল গ্রাম্য ঠাকুর অর্থাৎ ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে পূজা ক'রে বেড়াত। সেই মামলায় সে নির্জ্জলা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে পুলিসের সুনজরে পড়ে। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আন্নু নিজের গ্রামে সার্ব্বভৌমত্ব অর্জ্জনের জন্য এমন ক্রিয়াকলাপ অনেক করেছিল, যার ফলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। সর্ব্বশেষে আন্নু নিজের একখানা গোয়াল-ঘরে নিজে আগুন দিয়ে পুলিসকে জানালে, গ্রামের লোকে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। পুলিস সমস্ত বুঝে আন্নুকে গোপনে শাসিয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আন্নুর এ ভাবের অন্যায়কে তারা সমর্থন করতে পারবে না, ভবিষ্যতে বাধ্য হয়ে তাকে সাজা দিতে হবে ; এবং সৎপরামর্শ হিসেবে দারোগা তাকে জানালে, এ গ্রাম ছেড়ে ফুল্লরাপুরে গিয়ে বাস করাই তার উচিত। রাজার প্রধান জায়গা। কাজকর্ম্ম জুটবে। থানাব গোপন কাজকর্ম্ম করলে তাতেও কিছু কিছু উপার্জ্জন হবে। আর এখানে থাকলে আন্নুর বিপদ অনিবার্য্য। আন্নু সেই এসে এখানে বাস করছিল। আন্নুর মা লোকের বাড়িতে দেবসেবার ভোগ রান্না করত, আন্নু পূজা করত। অন্য সময়ে আন্নু এখানে ওখানে ঘুরে যে সব খবর সংগ্রহ করত, জানিয়ে আসত থানায়। আন্নুর জন্যই শশী ধরা পড়েছে তিনবার। আন্নুর জন্যই ডাক্তারের ফেরারী এক খুড়তুতো ভাই ধরা পড়ল

সেদিন। গত আগষ্ট মুভমেণ্টের সময় থেকে ডাক্তারের ভাইকে পুলিস খুঁজছিল।

শুধু শশীই নয়, ডাক্তারই নয়, ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যও আন্নুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। চণ্ডীমায়ের ওই পূজক পদটির প্রতি আন্নুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। ভট্টাচার্য্যের পূজাপদ্ধতির ভুল অবহেলা প্রভৃতির প্রতি চতুর চরসুলভ দৃষ্টি সজাগ রেখে ঘোরাফেরা সে অনেক করেছে; না পেয়ে, ভট্টাচার্য্যের নামে রটনা আরম্ভ করেছিল—ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য চণ্ডীতলা লুটে খাচ্ছে। হাতে-নাতে প্রমাণ বাবা, সন্ধের সময় ভটচায্যি যখন বাড়ি যায়, তখন তার পোঁটলাটা দেখো।

চণ্ডীমাকে যে যা পূজা দেয়, তার একটা অংশ ভট্টাচার্য্যের বিধিমত পাওনা। দেবস্থানের অংশটা ভট্টাচার্য্য মশায়ই ভাগ ক'রে দেবভাণ্ডারে জমা রাখেন। আন্নু বলত, বেড়ালে মাছ ভাগ করলে গেরস্থতে কি পায়? এখানকার লোকেরা কানা—কানা—কানা!

তাতেও যখন কিছু হ'ল না, তখন আন্নু দারোগাকে বলেছিল, চণ্ডীতলায় ফেরারী আসামীরা সন্ন্যেসী সেজে আসে। আমি নিজে দেখেছি, অল্প বয়সে, গাঁজা খায় না, ইংরেজী বই পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একজন অল্পবয়সী লেখাপড়া-জানা সন্ন্যাসী এসেছিলেন চণ্ডীতলায়; বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের ভারি ভাল লেগেছিল সন্ন্যাসীটিকে। যত্ন ক'রে তিনি খাওয়াতেন, যেতে চাইলে আরও দুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করতেন। দারোগা একদিন সন্ন্যাসীকে জেরা আরম্ভ করলেন, আপনার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

সন্ন্যাসী হেসে বলেছিলেন, সে বলব না, বলবার নিয়ম নয়।

দারোগা তল্লাস করলে সন্ন্যাসীর জিনিষপত্র। কয়েকখানা চিঠি-পত্র পড়েই দারোগা থতমত খেয়ে গেল। রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর কেদার গাঙ্গুলীর চিঠি—প্রাণাধিকেষু, মাই ডিয়ার সান

বলে পাঠ, ঘরে ফিরে সংসারী হবার জন্য অনুরোধ মিনতি। দারোগার বুদ্ধি যতই বাঁকা হোক, এ ক্ষেত্রে সোজা জিনিসটা বুঝতে তার বিলম্ব হল না। সে ক্ষমা চেয়ে বললে, যখন যা অসুবিধে হবে আমাকে জানাবেন। মানে, যা দরকার হবে আপনার। মানে প্রয়োজন হলেই জানাবেন আপনি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারিপাশ ঘুরে দেখে, কাকে বললেন জানি না, হারামজাদা বামুন কোথায় গেল ? আন্নু, সেই আন্নুটা ?

সেই আন্নু ভট্টাচার্য্যি আজ মবল।

যারা আন্নুর শবযাত্রা দেখে নাই, তাদের প্রতিটি জন বললে, একটা আপদ গেল। আন্নুর উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না।

শশী এসে আপনার দাওয়ার উপর বসল, বার বার ভাবতে চেষ্টা করলে, আন্নু মরেছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু বার বারই তার মনে হল নরম সোনায় গড়া সুডোল দুখানি হাতের কথা। রঙ-উঠে-যাওয়া সাদা দুগাছি শাঁখায় সে হাত দুখানি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল ! সেই হাত দুখানিকে নিরাভরণ কল্পনা করতে গিয়ে বার বারই তার চোখে জল এল।

শশীর স্ত্রী ঘরের ভিতর কাজ করছিল। শশীর পায়ের শব্দ সে চেনে। গভীর রাত্রে শশী যখন দ্রুত এবং প্রায়-শব্দহীন পদক্ষেপে বাড়ি ফেরে, তখন সে জেগে কান পেতে ব'সে থাকে এবং শশীর পদক্ষেপ প্রায়-শব্দহীন হ'লেও ওই অতিক্ষীণ শব্দের মধ্য থেকে বুঝতে পারে যে, শশী ফিরছে। সে দরজা খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। শশীর পায়ের শব্দ শুনেই সে জল-পরিপূর্ণ ঝকঝকে তকতকে একটি কাঁসার বাটি এনে তার পাশে নামিয়ে দিলে। শশী কুনিয়ান খেয়েছে, এইবার মাদুলি-ধোয়া জল খাবে। বাটিটার দিকে একবার চেয়ে দেখে শশী চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বউ বললে, খাও।

শশী তার দিকে ফিরে চেয়ে বললে, উঁ ?

মায়ের মাতুলি ধুয়ে জল খাও। ওই দেখ, জল দিয়েছি।

হুঁ।

বউ চ'লে যাচ্ছিল। শশী ডেকে বললে, বোতলটা দে তো।

বোতল? শশীর বউ আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আবার শশী বউয়ের দিকে ফিরে চাইলে। বউ আতঙ্কিত হয়ে উঠল; এই ফিরে চাওয়ার মানেই হল, শশী এইবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এসে তার চুলের মুঠি ধ'রে মাটির উপর আছড়ে ফেলে দুটি লাথি মেরে বলবে, হ্যাঁ, বোতল। শুনতে পাও না হারামজাদী? শশী উঠল। বউটা ভয়ে চোখ বুজে ঘাড় পিঠ সঙ্কুচিত ক'রে হাত দুটি মাথার উপরে তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শশী কিন্তু বউকে মারলে না, সে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বোতলটা বার ক'রে খানিকটা নির্জ্জলা মদ খেয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মনে হল, বুকের ভিতরটা যেন হু-হু করছে, মাথার তালু থেকে সমস্ত কপালটা কেমন ঝিমঝিম করছে। গায়ে যেন বল নাই; পা যেন টলছে। এতটুকু মদে এতখানি নেশা শশীর কখনও হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়াল লা-ঘাটার ঘাটে। সামনে নদী দেখে তার খেয়াল হল। ঘাটের পূব দিকে শ্মশান। সে নিজেই চমকে উঠল। শ্মশানে তিনটা চিতা জ্বলছে। শশীর দেহ থেকে বল যেন নিঃশেষে চলে গিয়েছে, তার হাত-পা নাড়বারও যেন ক্ষমতা নাই, তার মুখটা পর্য্যন্ত হাঁ হয়ে গেল, হাঁ ক'রে সে চেয়ে রইল ওই তিনটা জ্বলন্ত চিতার দিকে। মরণকে শশীর বড় ভয়।

ও-পার থেকে খেয়া-ডোঙাটা এসে এ-পারে লাগল। যাত্রী নাই। অকারণেই ডোঙাটা নিয়ে এসে এ-পারে লাগালে নোটন মুচি—ডোঙার খেয়া-মাঝি। চারিদিকে রোগ, রোগ আর রোগ, লোকের পথ হাঁটবার শক্তি কোথায়? যাবার আসবার মত মনের উৎসাহ কোথায়? তবু নোটন, ব'সে থাকে ডোঙা নিয়ে; পেটের দায় বিশ টাকা মণ চাল, সে চাল আসবে কোথা থেকে? যে দু-চারজন কি

দশজন আসে, তাদের পার করলেও কুড়ি পয়সা হবে। সে ডোঙার উপর বসে থাকে আর শ্মশানের চিতার সংখ্যা গণনা ক'রে যায়। ওতে নোটনের সময় কাটে। শশী নোটনের একজন বড় মক্কেল। বন্যার সময় দু-এক দিন রাত্রে শশী নোটনকে ডাকে। নোটন তাকে পার ক'রে দেয়। তার জন্য শশী যা দেয়, আজকালকার রোজকারের অনুপাতে সে নোটনের দশ-বিশ দিনের রোজকার!

শশী।

অ্যাঁ? নিতান্ত বোকার মত শশী উত্তর দিলে।

কিছু বলছিস নাকি? মৃদুস্বরে নোটন প্রশ্ন করলে, আজ রাত্রে ডোঙা চাই নাকি?

শশী উদাস কণ্ঠে বললে, আন্নু ঠাকুর আজ মলো।

নোটন অবাক হয়ে গেল। আন্নু মরেছে, তাতে শশী এমন মনমরা হয়ে গেল কেন? শশী বললে, পোড়াতে এসেছে আন্নুকে।

নোটন কথাটা জানে, সে এই ঘাটেই বসে আছে—ডোঙার উপর বসে চোখ মিটমিট ক'রে দেখছে, কে কে এল শ্মাশানে! এই তো এখন তার একমাত্র কাজ হয়েছে। আজ সকাল থেকে এসেছে আটজন। ভোরবেলায় একদল তার আসবার আগেই চলে গেছে। তারপর সকাল থেকে আটজনের মধ্যে আকুনিয়া গ্রামের দুজন, কৃষ্ণপুরের একজন, ফুল্লরাপুরের পাঁচজন—ছিদেম বাউড়ীর বউ, হরিশের নাতি, কণ্ঠর মা, গোকুল ডোম, সব শেষে এসেছে আন্নু ঠাকুর।

নোটন বললে. হ্যাঁ। ওই সব চান ক'রে উঠছে ঘাট থেকে।

শশী ব্যগ্র দৃষ্টিতে শ্মশানের ঘাটের দিকে তাকালে। নোটন নদীর বুকে ডোঙার উপর বসে আছে, সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে শশী কিছু দেখতে পেলে না। নদীর খাড়া উঁচু পাড় এবং পাড়ের উপরে কাদা-জামের ঝাঁকড়া গাছগুলাতে ঘাট আড়াল পড়েছে।

শশী এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে চলল।

নোটন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মরণকে শশীর বড় ভয়, নেহাত দায়ে না পড়লে সে শ্মশানে আসে না। সে ডাকলে, শশী!

শশী এগিয়ে গেল, কথার উত্তর দিলে না।

আহা, মেয়েটি তো নয়, সত্যিই ননীর পুতুল!

স্নান ক'রে উঠে গা-মোছা হয় নি, কাপড় নিঙড়ে ফেলতে পারে নি, ভিজে কাপড় সর্ব্বাঙ্গে লেপ্টে লেগে গেছে। ভিজে ময়লা কাপড়খানার উপরেও চাঁপাফুলের মত রঙ ফুটে বেরিয়েছে। কালো চামরের মত কসকসে কালো রুখু চুলের রাশির প্রান্তভাগটা কাপড়ের প্রসার ছাড়িয়ে পড়েছে। চুলের ডগাগুলি বেয়ে জল পড়ছে, রোদের ছটায় টলমলে মুক্তোর মত টোপা টোপা জলবিন্দু। শশী দেখতে চেয়েছিল সেই সুন্দর হাত দুখানি। শাঁখা দুগাছা ভেঙে দিয়েছে, লোহা খুলে ফেলে দিয়েছে;—ননীতে গড়া সেই সুন্দর হাত দুখানিকে খালি নিরাভরণ দেখে মনে সে দুঃখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার হাত দুখানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা পড়েছে। সে তাকালে পায়ের দিকে। ইটে ঘষে আলতার দাগ তুলে দিয়েছে, পা দুখানি দেখে শশীর কান্না পেল। আঃ—আঃ—হায়—হায় রে!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বের হ'ল বউটির হাত দুখানি! আন্নুর মায়ের কোলে ছিল দু বছরের খোকা! নিরাভরণ হাত দুখানি বের ক'রে বউটি ছেলেটিকে নিজের কোলে নিতে চাইলে।

আন্নুর মা ব'লে উঠল, থাক, থাক, আমার কোলেই থাক। কিন্তু মেয়েটি শুনলে না, মানলে না, জোর ক'রে টেনে ছেলেটিকে নিয়ে আপনার বুকে ফেলে জড়িয়ে ধরলে।

শশী দেখছিল সেই শূন্য দুখানি হাত।

ননী দিয়ে গড়া চাঁপার বরণ হাত দুখানিকে আগের চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে; খাঁ-খাঁ করছে হাত দুখানি, ওই হাত দুখানির দিকে চেয়ে শশীর মন খাঁ-খাঁ করছে। বউটির আশপাশ, চারিদিকের

মাঠ-ঘাট সমস্ত খাঁ-খাঁ করছে, যেন বউটি তার ওই খাঁ-খাঁ করা খালি হাত বুলিয়ে দিয়েছে সমস্ত কিছুর উপর।

ব—ল—হ—রি হরি—বো—ল! শ্মশানবন্ধুরা ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সামনেই চণ্ডীতলা। সকলে গিয়ে উঠল চণ্ডীতলায়। এখানকার নিয়ম এই। শ্মশান থেকে ফিরবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম ক'রে তবে গ্রামে প্রবেশ করে। মায়ের আশীর্ব্বাদী পুষ্প নেয়, চরণোদক খায়, চণ্ডীতলার মৃত্তিকা গায়ে মাখে। শ্মশানের অকল্যাণ দূরে যায়। শশীও গিয়ে ঢুকল চণ্ডীতলায়।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য দাঁড়িয়েছিলেন।

আন্নুর মা কেঁদে উঠল, চণ্ডীমায়ের উঠানে সে মাথা কুটতে আরম্ভ করলে, কি করলে মা গো? কি দোষ করেছিলাম গো?

ভট্টাচার্য্য বললেন, কেঁদো না, কেঁদো না। ওঠ, ওঠ। ভট্টাচার্যের কথা বলবার ভঙ্গী সেই চিরকেলে আশ্চর্য্য ভঙ্গী। সুখও নাই, দুঃখও নাই, অদ্ভুত! বললেন, নাও চরণোদক নাও। পুষ্প নাও!

আন্নুর মা উঠল। ভট্টাচার্য্যের কথা বলার এই ভঙ্গীর এমনিই গুণ। শুধু আন্নুর মা নয়, সব মানুষকেই উঠতে হয়, চোখ মুছতে মুছতে চরণোদক-পুষ্প নিতে হয়! যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ কাঁদতে পারে না। ভট্টাচার্য্য হাসেন, যে হাসি তিনি পৌত্রের অসুখে হেসেছিলেন, বাবুর দৌহিত্রের শিয়রে ব'সে হেসেছিলেন, বলেন, মাকে নিষ্ঠুর ব'লো না মা। সংসারে কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত পাপ। তা থেকে মুক্তি দিয়ে ধূলো ঝেড়ে তিনি তাকে আপন বুকে তুলে নিয়েছেন। এ তো মুক্তি! নিজের মুক্তি কামনা কর। যারা শোনে তারা উদাস হয়ে থাকে, চোখের জল যেন থমকে যায়।

আন্নুর মা চোখ মুছে চারিদিক চেয়ে বললে, বউমা কোথায়

গেল? বউমা! অ বউমা! আঃ, কি বিপদেই আমি পড়েছি মা!

বউটি দাঁড়িয়ে ছিল নাটমন্দিরের একটি থামের আড়ালে। এদিক ওদিক দেখে আন্নুর মা তাকে টেনে নিয়ে এল।—দিন বাবা, খোকাকে চরণোদক-পুষ্প দিন। ওই খুদকুঁড়োটুকুই আমার সম্বল—আন্নুর—

কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে এল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে আন্নুর মা বউয়ের ঘোমটার ফাঁকে মুখ রেখে বললে, হাত পাত, চরণোদক নাও, পুষ্প নাও, খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পাত।

বউটি মুখ তুললে, মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে সে চাইলে শাশুড়ীর দিকে।

আন্নুর মা বললে, বিরক্ত হয়েই উচ্চকণ্ঠে বললে, আমার মাথা খেয়ে হাত পাত। চরণোদক নাও। খোকাকে দাও, নিজে খাও! হাত পা—ত।

এবার সে হাত বাড়ালে। তারুণ্যের অপরূপ লাবণ্যে ভরা সুগৌর সুডৌল দুখানি হাত বৈধব্যের নিরাভরণ দীনতায় কাঙাল হয়ে গেছে। আন্নুর দেহ যখন নিয়ে যায়, তখনও হাত দুখানিতে রঙ-চটা পুরানো সাদা শাঁখা দুগাছিতে যে শোভা ছিল, সে শোভা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য দেখেছিলেন। চরণোদক দিতে দিতে তিনি ব'লে উঠলেন, তারা—তারা মা!

তারা-নাম ভট্টাচার্য প্রায়ই উচ্চারণ করেন। নাম উচ্চারণের জন্য নয়, তাঁহার কণ্ঠস্বরের জন্য সকলেই ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকালে। তাকালে না শুধু মেয়েটি। ছেলেটিকে এক হাতে কোলে চেপে ধরে একটি হাত বাড়িয়ে সে তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ভট্টাচার্য্যের চোয়ালের হাড় দুটি অস্বাভাবিক চাপে উঁচু হয়ে

উঠেছে, নীচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের উপর ঠেলে উঠেছে ; যেন মৃদু দ্রুত কম্পনে কাঁপছে মনে হয়।

ভট্টাচার্য্যের বুকের ভিতর সত্যই একটা আবেগ জেগে উঠেছিল। বহুকাল, বোধ হয় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর একমাত্র কন্যা চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, তাঁর মনে পড়ে গেল সেই স্মৃতি। কিন্তু তাঁর কন্যার নিরাভরণ হাত দুখানিতে এমন কাঙাল ভাব ফুটে উঠে নাই। প্রাণপণে আত্মসম্বরণ ক'রে ভট্টাচার্য্য বললেন, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ছেলে শতায়ু হবে, মানুষের মত মানুষ হবে। ওই তোমার দুঃখ ঘোচাবে।

আন্নুর মা আবার হাউহাউ ক'রে উঠল। শুধু আন্নুর মা নয়, শ্মশানবন্ধুরা সকলেই চোখ মুছলে। কিন্তু অবগুণ্ঠনাবৃতা ওই মেয়েটির কোন স্পন্দন-চিহ্ন বুঝা গেল না। ভিজে কাপড় তখনও প্রায় গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে লেগেছিল, তবুও কিছু বুঝা গেল না।

চরণোদক দিয়ে ভট্টচার্য্য তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলে গেলেন। ঘাটে কে বসে রয়েছে! উপুর হয়ে বসে হাতের ছাঁদের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল শশী। ভট্টাচার্য্য বিরক্ত হয়েই বললেন, কে?

শশী মুখ তুললে। সে বসে বসে কাঁদছিল।

কি রে শশী, কাঁদছিস কেন?

শশী হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। বললে, আঃ বাবাঠাকুর, আমার মরণ কেনে হয় না?

কি হ'ল তোর?

আঃ, ওই সব কচি কচি মেয়ে বিধবা হচ্ছে বাবাঠাকুর, কত লোক ম'রে যেছে, এ যে আর দেখতে লারছি বাবা।

আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল। ভট্টাচার্য্য অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

আন্নুর মা পৃথিবীতে অনেক কাল এসেছে। কোপার ঘা খেয়ে ছাদ যখন জমে যায়, তখন মুষলধারার বর্ষণেও যেমন গলে না,

তেমনই ভাবেই আন্নুর মায়ের বুকের ভিতরটা জমে গেছে। সংসারের নিষ্ঠুর অভাব-অনটনের বর্ষণের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা বজ্রাঘাত হয়, তাতে ছাদের মত জমাট বুকটায় এক-একটা চিড় খায়, সে ফাটল দিয়ে অল্পস্বল্প জল ভিতরে যায়; কিন্তু অধিকাংশই পিছলে বেরিয়ে যায়। সে চণ্ডীতলাতেই বসে ছিল চারটি প্রসাদের জন্য। ভট্টাচার্য্যের ঠোঁটের কম্পন তার চোখ এড়ায় নাই। সে সেই সুযোগ আঁকড়ে ধরেছে। একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে সে ঢুলছিল।

হঠাৎ বউটি তার হাত ধরে টানলে।

আঃ, ছাড়! কি?

উত্তর না দিয়ে বউটি তবু টানছে। আন্নুর মা অভ্যাসমত বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে, কি? আমার মাথা খাও তুমি। কি, হল কি?

বউ তার হাতখানা টেনে কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির কপালের উপর রাখলে।

আন্নুর মা এবার ঈষৎ চঞ্চল হল, ভাল ক'রে নিজে ছেলেটির কপালের উপর হাত দিয়ে দেখে বললে, ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে যেন মনে হচ্ছে। হুঁ। তারপর সে বললে, ও তোমার কিছু নয়। রোদ লেগেছে। রোদ থেকে সরে বস। কথাটা বলে যেন তার তৃপ্তি হল না, বউয়ের হাত ধরে টেনে সরিয়ে এনে বললে, সরে বস।

শশী উপু হয়ে বসে ছিল, তার আর সহ্য হল না, সে রূঢ়স্বরে বললে, কি রকম মানুষ তুমি ঠাকরুণ? যেমন বেটা ছিল তোমার, তেমনই তুমি? এইখানেই তুমি নড়া ধরে হিঁচড়ে টানছ, ঘরে গিয়ে তা হলে তো মারবা তুমি ধরে!

শশী জাতিতে ডোম, ও অঞ্চলে ছোটলোক বলে, কিন্তু সে দাগী চোর, সেই কারণে লোকে তাকে ভয় করে। আন্নুর মা তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, ছেলেটার গা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে বাবা, তাই বলছি, রোদ্দুর থেকে সরে বস। তা

কানের মাথা খেয়ে কথা কানে নেয় না আবাগী, তাই সরিয়ে দিলাম টেনে। আমারও তো বাবা মানুষের শরীর।

শশী এত সব কথা শুনছিল না, সে দেখছিল, বউটি ওই ননীর মত হাত দুখানি দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের কপাল নিজের গালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ অনুভব করছে।

শশী বললে, জ্বর হয়েছে? ঠাকরুণ, দেরি ক'রো না। ডাক্তার দেখাও আজই।

ডাক্তার?

হ্যাঁ। আর বাবাঠাকুর যে পুষ্প দিলেন, গলায় বেঁধে দাও।

আন্নুর মা হাসলে; বললে, ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথা পাব বল?

যাও কোনে ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু তো মানুষ বটে, না, পাথর? ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, মায়া হবে না ডাক্তারের?

আন্নুর মা শশীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইল। সে চাউনির সম্মুখে শশী যেন কেমন অস্বস্তি অনুভব করলে। তাকিয়ে আছে দেখ দেখি! ঠায় একদৃষ্টে, পলক পড়ে না!

আন্নুর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সকরুণ কণ্ঠে বললে, ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী? আমার পোড়া পেটের কথা ছেড়েই দিলাম, ওদের আমি বাঁচাব কি ক'রে? আঃ, আমার সোনার পুতুল বউ!

শশীর চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ হল।

॥ চার ॥

পরদিন সকালবেলা। ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীরা এসে বসে আছে। সংখ্যায় ষাটজনের কম হবে না—কঙ্কালসার শরীর, ফুলো ফুলো মুখ, হাত-পাও ফুলেছে, হলুদ চোখ, রুগ্ন গায়ের কাপড়-চোপড়ের গন্ধে বাতাস পর্য্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কম্পাউণ্ডার চিনেমাটির বড় খলটায় ঘটখট শব্দে ওষুধ মাড়ছে। ডাক্তার নাই, কলে বেরিয়েছে। টাকা দিয়ে যারা ডাক্তারকে ডাকে, ডাক্তার তাদের বাড়িগুলো প্রথমেই সেরে আসে।

রোগে যারা বেশী কাতর, তারা কাতরাচ্ছে।

যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা আলোচনা করছে কে কে মরেছে গত রাত্রে। বদি দত্তর বউ, মহাদেবের সদ্যবিবাহিতা কন্যা, ঘোষেদের মেয়ে সরলা। সত্যরাম বাউড়ী মরেছে মাঠে; আউশ ধান কাটতে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে। বিকেল পর্য্যন্ত ফিরল না দেখে খোঁজ ক'রে সত্যরামকে ধানের উপর মুখ গুজে পড়ে থাককে দেখতে পেয়েছে।

ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারির পাশেই ধ্বজু সিঙের দোকান। ধ্বজুর আড়তের সঙ্গে কন্‌ট্রোলের দোকান আছে—কেরোসিন তেল, চিনি বিক্রি হয়। তার সঙ্গে আছে সরকারী ভিক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা। ওখানে একটা জনতা জমে গেছে। চাল ফুরিয়ে গেছে, বিলি হচ্ছে ঘাসের বীজের মত এক রকম জিনিস, নাম বলছে—বাজরা। তাই নিতেই ভিড়ের অন্ত নাই। নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগও করছে।

আন্নুর মাও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বাজরা নিয়ে সেগুলি নেড়ে চেড়ে বললে, এ কি করে খাবে মানুষে?

ধ্বজু বললে, এও আর বড় জোর আসছে সপ্তা। তার পরই ফুরুবে, আর নাই।

একটি লোক হেসে বললে, আজ্ঞে, তা চলবে।

চলবে! ওই দেখ্, কটা বস্তা আর পুঁজি? আর লোক দেখছিস তো?

আজ্ঞে, এ খেলে সাত দিনেই লোক অনেক পাতলা পড়ে যাবে।

আন্নুর মা ভাবছিল, নাতিকে আর বউটাকে এই একটু বেশি ক'রে খেতে দেবে। তা হলেই সে খালাস। ঝাড়া হাত-পা। পরক্ষণেই সে শিউরে উঠল। বউটাই তো তার ভরসা। কালই সে কথা আন্নুর মা খুব ভালভাবে বুঝে নিয়েছে।

ভট্টাচার্য্য কেঁদেছে সে দেখেছে, এবং সে যে ওই বউটার প্রতি মমতায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু কান্নাই নয়, কাল ভট্টাচার্য্য তাদের যে পরিমাণে প্রসাদ দিয়েছে, সে আন্নুর মা আশাই করে নাই। শশীর কান্নাও তার মনে পড়ল, সেও ওই বউটার উপর মমতায়। শশীই তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যে বলেছিল, ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, ডাক্তারের মায়া হবে না!

চণ্ডীতলা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে শশীর কথাটা আন্নুর মা পরখ করেও দেখেছে। শশীর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ডাক্তারের মায়া হয়েছিল। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে ডাক্তার কারও নয়, ওই সময়টায় সে খানিকটা বিশ্রাম করে, লাখ টাকা দিলে উঠে না। ডাক্তার শুয়ে ছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আন্নুর মা ভাবছিল, ডাক্তারকে ডাকবে কি না! ছেলেটার জ্বর সত্যি বেশি। বোশেখ মাসের দুপুরের কচি লতার মত নেতিয়ে পড়েছিল। জানালাটা ফাঁক হয়ে ছিল, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে আন্নুর মা বার দুয়েক চেয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ডাক্তার দেখা দিলে, কে? কি?

আন্নুর মা সভয়ে বলেছিল, আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বউমার খোকটির বড় জ্বর। হতভাগী আজই হাতের শাঁখা ভাঙলে, সিঁথের সিঁদুর মুছলে, আবার ওই ছেলেটুকু, তার—। আন্নুর মায়ের চোখ ফেটে

হু-হু ক'রে জল বেরিয়ে আসছিল—তার আন্নু, আঃ, তার সোনার আন্নু! কিন্তু তার জন্যে সে কাঁদলে লোকে তাকে মায়া করবে না। আন্নুর মা দাঁতে দাঁত টিপে বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল।

ডাক্তার বেরিয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, হুঁ। এ যে অনেকখানি জ্বর! কখন জ্বর এল?

শ্মশান থেকেই বোধ হয়।

ডাক্তার যত্ন ক'রে দেখে ওষুধ দিয়েছে। পয়সার কথা মুখেও আনে নাই। বরং বাড়ির ভিতর থেকে একটা পুরিয়া ক'রে খানিকটা সাগু দানা এনে দিয়ে বলেছিল, এই সাগু ক'রে দিও। সাগুদানা বাজারে নাই, থাকলেও চার টাকা সের।

আন্নুর মা সাগুর পুরিয়াটা নিজে হাতে নেয় নাই। অবগুণ্ঠনবতী বউয়ের কানের কাছে ডেকে বলেছিল নাও বউমা, সাগুর পুরিয়াটা নাও। ওগো, হাত পাত। আঃ, কি আবাং মেয়ে গো তুমি! হাত—হাত— হাত পা—ত।

ডাক্তার বলেছিল, বকবেন না ওঁকে। ছেলেমানুষ তার ওপর এত বড় একটা আঘাত—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ডাক্তার।

আন্নুর মায়ের মুখে ফুটে উঠেছিল অতি ক্ষীণ—কিন্তু অতি বক্র একটি হাসির রেখা। কিন্তু তার শীর্ণ রেখাঙ্কিত মুখের অজস্র রেখার মধ্যে সে হাসি চোখে পড়বার মত নয়।

ধ্বজু সিঙের দোকানে সরকারী ভিক্ষা আড়াই সের বাজরা আঁচলে নিয়ে আন্নুর মা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারির সামনে। ছেলেটার আবার ওষুধ চাই। সমস্ত রাত ছেলেটা জ্বরে ধুঁকেছে। ডাক্তার সাগুদানা দিয়েছিল, সে সাগুদানা তেমনিই আছে। মায়ের দুধই খেতে চায় নাই, তো সাগুর জল।

ডিস্‌পেন্সারির দিকে পা বাড়াতে কিন্তু আন্নুর মায়ের দ্বিধা হচ্ছিল! ভাবছিল, ডাক্তারের সামনে সে গিয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু

ডাক্তার যদি বলে, ওষুধের দাম এনেছ ? তার চেয়ে বাগদী বুড়ীকে সঙ্গে দিয়ে বউটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই ফ্যাসাদের মধ্যে আর আন্নুর মাকে পড়তে হবে না। আজ সে বলে দেবে বউটাকে, যাকে বলে—কানে কিল মেরে বলে দেবে, এতখানি ঘোমটার আদিখ্যেতায় কাজ নাই। ঘোমটাটা একটুখানি কম কর। মুখের দিকে চাইলে মানুষের মায়া হবে। মনে মনে এত সব ভেবেও কিন্তু আন্নুর মা গলা বাড়িয়ে ডিস্‌পেন্সারির ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে। নাঃ, ডাক্তার নাই।

রতন হাড়ী বললে, দশটার পরে ঠাকরুণ, দশটার পরে। কম্পান্‌ডারবাবু বলছে, দশ বাড়িতে ডাক আছে। তা ছাড়া আমরা সব আগাম এসে বসে আছি।

আগাম এসেছিস, তোরা সব আগাম মর।—মনে মনে এই অভিসম্পাত দিয়ে আন্নুর মা খুশি হয়ে বাড়ির পথ ধরলে। শুধু গাল দিয়ে নয়, ডাক্তারের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বলেই সে খুশি হয়েছে বেশি।

প্রতিদিনের মত আকাশে উড়ো-জাহাজের দল আসছে। গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আন্নুর মা আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলছিল। শুধু সে নয়, সব লোক, সবাই চেয়ে আছে।

এই যে আপনি !

আন্নুর মা চমকে উঠল। ডাক্তার ! ডাক্তার তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

আন্নুর মা ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আঁচলের বাজরা হাত দিয়ে নেড়ে বলতে গেল, পোড়া পেটের—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে, চলুন, আপনার নাতিকে দেখে যাই।

আন্নুর মা অবাক হল না। ডাক্তার নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়ে

বললে, এই এদের বাড়িতে ডাক ছিল, আপনার বাড়ির পাশে এসে মনে হ'ল ছেলেটির কথা। তা বাড়িতে কেউ নাই। বউটি ছেলে-মানুষ, ঘোমটা টেনে বসে আছে, কথা বলে না—

আন্নুর মা হাউমাউ ক'রে উঠল, কপাল, আমার কপাল পোড়া কপাল বাবা, কি বলব লজ্জার কথা, বল! ও মানুষ নয় বাবা, ও মানুষ নয়, গরু-ভেড়ার সঙ্গে কোন তফাত নাই। শুধু ওই চেহারা! বলতে বলতেই আন্নুর মা প্রায় ছুটছিল, ডাক্তারের অনুগ্রহে সে যে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছে, তাই প্রকাশের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে কৃতকৃতার্থতা এতখানি যে, তার ঘা-খাওয়া শক্ত মনের অতি-বাস্তব সচেতনতাও এই সময়টিতে সাময়িক-ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার পর্য্যন্ত একটু ব্যস্ত এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল আন্নুর মায়ের আচরণে। সে বললে, থাক, থাক, এতখানি ব্যস্ত হবেন না, এতখানি—। আর ডাক্তারের মুখ দিয়ে কথা বের হ'ল না, এই মুহূর্ত্তে আন্নুর মা যা করলে, তাতে ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল। আন্নুব মা পুত্রবধূর মাথার ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে বললে, দেখ বাবা, দেখ, এই হতভাগীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, আর আমার বুক হু-হু ক'রে জ্বলে ওঠে। এর ওপর যদি ছেলেটার কিছু হয়—! আন্নুর মা ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তারেরও চোখ ফেটে জল এল।

অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ। রুক্ষ ঘন চুল। অদ্ভুত বড় দুটি চোখ—হ্যাঁ, অদ্ভুত, এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোন ভাষা নাই। ডাক্তার বুঝতে পারলে না তার অর্থ—বিস্ময় অথবা ভয়! ফ্যালফ্যাল ক'রে সে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। নারীসুলভ লজ্জাতেও সে দৃষ্টি নত হয় না। ডাক্তারের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা প্রবাহ বয়ে গেল, মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রবল মমতার আবেগ। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এর ওই শিশুটির যদি কিছু হয়, তবে সত্যই মেয়েটির অবস্থা

কি যে হবে, সে কল্পনা করা যায় না। মেয়েটির যা হবে, ডাক্তারেরই যে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

মিহিরবাবু তবুও ডাক্তার। আত্মসম্বরণ ক'রে সে বললে, ভয় কি? কিছু ভয় করবেন না, ছেলে সেরে যাবে।

মেয়েটিরও এতক্ষণে সম্বিত হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ঘোমটা টেনে দিলে।

পিছনে কে বলে উঠল, তারা! তারা!

ডাক্তার, আন্নুর মা মুখ ফিরিয়ে দেখলে, কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য, হাতে আঁকশি আর ফুলের সাজি। মিহির ডাক্তার মনে মনে অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠল। ভট্টাচার্য্যকে সে জানে। মনে পড়ল ভট্টাচার্য্যের নিজের পৌত্রের অসুখের কথা; নিষ্ঠুরতম কথা বলতে ভট্টাচার্য্যের বাধে না। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের দিকে চাইলে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য চেয়ে ছিলেন রুগ্ন শিশু এবং তার মায়ের দিকে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি ভট্টাচার্য্যের চোখে। ডাক্তারের ভয় হ'ল। ভট্টাচার্য্যের করুণার অর্থ অতি বিচিত্র।

ভট্টাচার্য্য কিন্তু বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ঠিক বলেছেন, কোন ভয় নেই।

আন্নুর মা বললে, বলুন বাবা, তাই বলুন, আশীর্ব্বাদ করুন।

ভট্টাচার্য্য বললেন, আশীর্ব্বাদ তো কালই করেছি মা। তোমরা চলে এলে, দেখলাম খোকার জ্বর এল, মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সমস্ত দিন মনের মধ্যে ওই কথাই ঘুরল আর ফিরল। সন্ধ্যেতে জপে বসলাম, মনে মনে বললাম, মা, আমার এ কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে বল্, তার আগে আমি মরি, মরে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার হাতের পূজো যদি নিস, তবে বল্, আশীর্ব্বাদী দে, যাতে দুঃখিনীর ধনের কল্যাণ হয়, রোগ ভাল হয়, দীর্ঘজীবী হয়ে সে বেঁচে থাকে; বলব কি মা! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মায়ের মাথা থেকে খসে পড়ল এই জবাফুল।

ডাক্তারের শরীর পর্য্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আন্নুর মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ওই তরুণী মা-টি, স্থির হয়ে বসে আছে পাথরের মত।

ভট্টাচার্য্য বলছিলেন, কাল রাত্রেই ভাবলাম, যাই, দিয়ে আসি মায়ের আশীর্ব্বাদী, তা বুড়ো মানুষ, চোখের নজর তো আর ভাল নাই। আর বেরুতে পারলাম না। নাও, ধর আশীর্ব্বাদী।

আশীর্ব্বাদী দিয়েও ভট্টাচার্য্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার অত্যন্ত ধীরভাবে ছেলেটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখছিল। পরীক্ষা শেষ ক'রে ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শনের সরঞ্জাম বের করলেন। আন্নুর মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, ডাক্তারবাবু।

ব্যাগ থেকে দেখে দেখে একটি ইন্‌জেক্‌শনের ওষুধের অ্যাম্পিউল বার ক'রে ডাক্তার বললে, ভয় নেই। ম্যালেরিয়া জ্বর।

তবে? ইনজেক্‌শন দেবেন কেন? রোগ কঠিন না হ'লে?

কঠিনে যাতে না দাঁড়ায়, তারই ব্যবস্থা করছি। কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন দেব। অ্যাম্পিউলটির মাথায় তুলো জড়িয়ে সুকৌশলে আঙুলের চাপে মুট করে মাথার দিকটা ভেঙে ফেলে ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিলে ওষুধটাকে। তারপর আন্নুর মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই দেখুন, আপনি মুখে দিয়ে দেখুন না এক ফোঁটা— কুইনিন, কি আর কিছু! বলে সে অ্যাম্পিউলটি উপুড় ক'রে ধরলে আন্নুর মায়ের হাতের উপর। প্রায় ফোঁটাখানেক ওষুধ ঝরে পড়ল। ডাক্তার হেসে বললে, দেখুন না!

আন্নুর মা জিব দিয়ে চেটে বিস্মিতভাবে মুখ নেড়ে কয়েকবার আস্বাদন অনুভব করবার চেষ্টা ক'রে বললে, কুনিয়ান তো তেতো ডাক্তারবাবু।

চকিত বিস্ময় ফুটে উঠল ডাক্তারের দৃষ্টিতে। আন্নুর মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ, তেতোই তো।

কিন্তু এ তো তেতো নয়।

তেতো নয়! ডাক্তার ভাঙা অ্যাম্পিউলটা তুলে ধরে দেখলে, তারপর সিরিঞ্জ থেকে এক ফোটা নিজের হাতে নিয়ে চেটে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল! শুধু স্পিরিটের গন্ধযুক্ত খানিকটা জল। ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সিরিঞ্জের ওষুধটুকু পিষ্টন ঠেলে মাটির উপর ফেলে দিয়ে বললে, যাক, ও-বেলা এসে আমি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাব। এ-বেলা ওষুধ দেব একটা। কেউ গিয়ে—

আন্নুর মা বললে, আমি যাব বাবা।

ডাক্তার উঠে আবার বললে, কোন ভয় নাই। দরকার হবে না, তবে দরকার হ'লে তখনই খবর দেবেন আমাকে।

ভট্টচার্য্য দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, শুনলে মা, ডাক্তার বললেন, কোন ভয় নাই। বলছি যে, আমার মা বলেছেন।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

ডাক্তারের সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে এলেন। পথে দুজনে একসঙ্গেই চলছিলেন। ঘটনাটা নূতন। কিছুক্ষণ পর ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ভয় নাই বলেই মনে হয়, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, আপাতত ভয় তো কিছু দেখলাম না। তবে ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া যদি হয়—। ডাক্তার চুপ করলেন। ভট্টাচার্য্য তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার নীরবেই পথ চলতে লাগল। ডাক্তারের নীরবতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ভট্টচার্য্য উদাস কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, তারা, তারা মা!

ডাক্তার ডিস্‌পেন্সারিতে এসে কুইনিনের অ্যাম্পিউলগুলি প্রত্যেকটি ভেঙ্গে নিজে আস্বাদ ক'রে দেখে ফেলে দিলে। নিজের মনেই বললে, স্কাউণ্ড্রেল। আন্নুর মা অ্যাম্পিউলের ভিতরের তরল পদার্থের আস্বাদ নিয়ে বলেছিল, তেতো নয়। সে তার ভ্রম নয়, অ্যাম্পিউলের ভিতরে কুইনিন নাই শুধু জল।

॥ পাঁচ ॥

শশী এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের বিরক্তির আর সীমা রইল না। রূঢ়স্বরেই সে বললে, তোকে না আমি কাল বলে দিয়েছি শশী, কুইনিন রোগীতে পাচ্ছে না, তোকে দিতে আমি পারব না। শিউলীর পাতা ছেঁচে খেগে, বেলপাতা ছেঁচে খেগে, ছাতিমের ছাল সেদ্ধ ক'রে খেগে যা।

আজ্ঞে না। সে জন্যে নয়; ওই—ওই আন্নু ঠাকুরের—

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বললে, কি? কি? আন্নু ঠাকুরের ছেলে কেমন আছে? এই তো দেখে আসছি আমি।

আজ্ঞে, তেমুনি আছে ছেলে। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।

ডাক্তার আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আন্নুর জন্য শশী তিনবার ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে, আর সেই শশী এসেছে—

ডাক্তারের বিস্মিত দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট, শশী মাথা নীচু ক'রে ঈষৎ লজ্জিতভাবেই বললে, ওই পানে আসছিলাম, তা আন্নু ঠাকুরের মা বললে, আমার নাতির ওষুধটা যদি এনে দাও বাবা শশী!

কথাটা বলেও তার মনে হ'ল, বলাটা তার সম্পূর্ণ হয় নাই, ডাক্তারের সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবও এ নয়। তাই সে আবার বললে, কাল শ্মশান থেকে এল মাশায়, ওই কচি বউটিকে দেখে বড় মায়া হ'ল। আ-হ-হা—মাশায়—ভগমানের—। শশীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে চুপ ক'রে গেল।

ডাক্তারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বস্ দিচ্ছি ওষুধ। ডাক্তার নিজেই উঠল ওষুধ তৈরি করতে। কম্পাউণ্ডারটি তার পাকা, গুঁড়ো কুইনিনের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সে কুইনিন সরিয়ে ফেলে।

শশী আপন মনেই বললে, কাল সারারাত ঘুমুই নাই ডাক্তারবাবু। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আন্নু ঠাকুর মরেছে, বেশ হয়েছে। কিন্তক ওই বউটির কথা মনে হয়েছে, আর হায়-হায় করেছি। শশী চুপ করলে।

নিবিষ্ট মনে ডাক্তার নিক্তির দিকে তাকিয়ে ওষুধ ওজন করছিল, সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। শশীর কথাগুলির সঙ্গে তার মনের তার এক সুরে বাজছে। এর মধ্যে এতটুকু কিছু অসঙ্গত দেখতে পেলে না।

বাইরে রোগীরা কাতরাচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার একটা বড় বোতল থেকে শিশিতে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে।

শশীর প্রাণ যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে ওদের মধ্যে বসে। মানুষের মরণ দেখে তার বড় ভয় হয়। কিন্তু জীর্ণশীর্ণ রোগা মানুষকে দেখে তার মন নাড়া খেত না। এক-একজনের কাতরানি দেখে তার হাসি পেত। মড়াকান্না শুনে তার রাগ হত। আপন মনেই সে বলত, আদিখ্যেতা! তোর কি একা মরেছে রে বাপু? কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে তার সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বউটির বৈধব্য দেখে তার মন সেই যে হায়-হায় করতে শুরু করেছে, সে হায়-হায়-এর আর বিরাম নাই। রোগা মানুষের কাতরানি শুনে তার বুকটা কেমন ক'রে উঠেছে, শোকাতুর মানুষের কান্না শুনে সে মনে মনে হায-হায় ক'রে সারা হয়েছে। এমন কি কাল রাত্রে চুরি করতে বেরিয়ে ঘোষেদের কানাচের গলি দিয়ে যাবার সময় ঘোষ-বুড়ীর গুন গুন স্বরে কান্না শুনে তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিল। মাথার বস্তাটা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল! ঘোষ-বুড়ীর মেয়ে সরলা কাল মরেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সবাই ঘুমিয়েছে, বুড়ী কেঁদে চলেছে। আগের দিন হ'লেও শশীর মনে হত, এই বস্তাটা বুড়ীর বুকে চাপিয়ে দেয়; বুড়ীর ওই বিনিয়ে বিনিয়ে

কান্না চিরদিনের মত বন্ধ ক'রে দেয় ; যে পথে গিয়েছে তার সরলা, সেই পথেই বুড়ীকে রওনা ক'রে দেয়। কিন্তু আর তা মনে হয় নাই! দাঁতে দাঁত টিপে সে কোনমতে গলি থেকে বেরিয়ে যখন আন্নুর মায়ের বাড়ির কানাচে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরিশ্রমের হাঁপানির সঙ্গে একটা শোকাতুর আবেগে তার ফুসফুস ফেটে যেতে চাচ্ছিল যেন। আন্নুর মায়ের ভাঙা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির একটা নিরালা কোণে কুমড়োলতার জঙ্গলের মধ্যে বস্তাটা নামিয়ে দিয়ে সেই-খানেই সে বুকে হাত দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে ছিল।

চণ্ডীতলায় আন্নুর মা যে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী? সে কথাটা ভুলতে পারে নাই। আন্নুর মায়ের দুঃখের জন্য নয়। ওই কচি বউ আর তার কোলের দুধের ছেলেটার জন্য সেও ভেবে সারা হয়েছে সমস্ত দিন। সত্যিই তো, কি খাবে ওরা?

না খেতে পেয়ে শুকিয়ে ছেলেটা প্যাঁকাটির মত হয়ে যাবে, পাখীর ছানার মত চিঁ-চিঁ ক'রে চেঁচাবে। বউটির ওই সোনার মত রঙের উপর ময়লার ছাপ পড়বে, ছেঁড়া কাপড়ে তার মাথার রুখু চুলের অর্দ্ধেকটা বেরিয়ে পড়বে, পিঠের গোটাটাই হয়তো দেখা যাবে ; একটা মাটির খোলা হাতে ক'রে ফিরবে।—শশীর বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বেরিয়ে পড়েছিল বস্তা হাতে! তার স্ত্রী বলেছিল, আজ আবার কি করতে যাবা? এই তো পরশু—

বাধা দিয়ে শশী হিংস্রভাবে অর্জ্জন ক'রে উঠেছিল!

শশীর স্ত্রী আর কিছু বলতে সাহস করে নাই।

সমস্ত সকালটা শশী আন্নুর মায়ের খিড়কির ধারে ঘুরেছে। আন্নুর মা যখন বাজরা আনতে এসেছিল, তখন থেকে ঘুরেছে। কিন্তু

বউটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল মাটির পুতুলের মত, তার ওই মুখের দিকে চেয়ে বাড়িতে সে কিছুতেই ঢুকতে পারে নাই। সে একটা ঝোপের আড়ালে বসে ঘাসের ডাঁটি তুলে তার নরম দিকটা চিবিয়েছে আর বউটির মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। তারপর এল আন্নুর মা, সঙ্গে ডাক্তার, একটু পরেই এল ভট্টাচার্য্য মশায়। ভট্টাচার্য্য ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর শশী বাড়ি ঢুকেছিল। ধানের বস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আন্নুর মা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বউটি কিন্তু একটি কথাও বলে নাই। সেই তেমনই ভাবে বসে ছিল। আন্নুর মা বলেছিল, তুমি একটু বসবে বাবা শশী, আমি তা হ'লে দশ সের ধান বেচে তুটি চাল ডাল নিয়ে আসি।

শশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু আন্নুর মা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল। ঘোমটা দিয়ে বউটি বসে আছে একভাবে সেই পুতুলের মত; খালি হাত তুখানি বেরিয়ে আছে, কোলের কাছে ছেলেটা শুয়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। চুপ ক'রে বসে শশীর মনে হয়েছিল, তার টুঁটিটা যেন কে চেপে ধরেছে, বুকের উপর একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে অনেকবার পুলিস তাকে হাজতে পুরে রেখেছে অন্ধকার রাত্রে। ছোট ঘরটায় সে একা বসে থেকেছে, শিক-ঘেরা দরজার ওপাশে কন্‌স্টেবল ঘুরেছে, তার চলন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শশার রাত কাটাতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজকের এই বসে থাকার উদ্বেগজনক কষ্টকর অনুভূতি কখনও সে ভোগ করে নাই। তাই দোকান থেকে ফিরে এসে আন্নুর মা যখন তাকে বলেছিল, আর একটু যদি কষ্ট ক'রে বস বাবা শশী, তবে আমি ওষুধটা নিয়ে আসি, শশী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, তুমি বস ঠাকরুণ, তুমি বস। আমি যেছি।

ডাক্তারের এখানে এই রোগা লোকগুলির মধ্যে বসে তাদের কাতরানি শুনে তার প্রাণ আবার হাঁপিয়ে উঠছে। মধ্যে মধ্যে

মনে হচ্ছে, উঠে ছুটে পালিয়ে যায় সে, কিন্তু সেই হাতখানি তাকে যেন ডাকছে, কই, আমার খোকার ওষুধ ?

*   *   *

আট দিন পর।

ডাক্তার চুপ ক'রে বসে ছিল তার ডিস্‌পেন্সারির সামনের খোলা দাওয়ার উপর। রাত্রি আটটা বাজে। কার্ত্তিক মাসের শেষ, এবার এরই মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। ভাদ্রের বন্যার জলের ঠাণ্ডা উঠেছে মাটি থেকে। গ্রামখানার এই দিকটাকেই বলে—বাজারপাড়া। এ পাড়ায় মানুষের সাড়া সাড়ে দশটা এগারোটার কমে কখনও স্তব্ধ হয় না। দোকানে দোকানে আলো জ্বলে। লটকোনের দোকানে খাতা মেলায়, তহবিলের টাকা গুনতি হয়। ময়রাদের দোকানে ভিয়েন চলে, বাতাসা কাটে, কদমা কাটে, রসের সন্দেশ পাক করে—সারা রাত রসে ভিজতে পায়। কাটা কাপড়ের দোকানে খটো-খটো শব্দ ক'রে কল চলে। কাপড়ের দোকানে কাপড়ের নম্বর দেখে থাকে থাকে সাজানো চলতে থাকে। দু-পাশের দোকানের মাঝখান দিয়ে যে পাকা রাস্তাটা চলে গেছে এক দিকে মুরশিদাবাদ অন্য দিকে বেহার, সেই পথে ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ তুলে গরুর গাড়ি যায় আসে;—বেহারের দিক থেকে আসে শালকাঠ, শালপাতা; মুরশিদাবাদের দিক থেকে আসে কলাই, কুমড়ো, পেঁয়াজ, লঙ্কা, নিকটবর্ত্তী অঞ্চল থেকে আসে ধান। ওদিক থেকে সাঁওতালেরা আসে মজুরির সন্ধানে। এদিক থেকে আসে স্থানীয় লোকজন, পূর্ব্বের অঞ্চলের সাত-আট ক্রোশের মধ্যের গ্রামগুলির এইটিই নিকটস্থ রেল-স্টেশন। এবার কিন্তু এরই মধ্যে সব স্তব্ধ অন্ধকার। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। ডাক্তার পথের দিকে চেয়ে বসে ছিল।

ডাক্তারের মেয়ে ডেকে বললে, ঘরে বাবা, এসে বসুন, মা বলছেন, হিম পড়ছে যে।

যাচ্ছি।

খাবার করবেন?—মা জিজ্ঞাসা করলেন।

না। শশী ফিরবে, মতিপুর গেছে। তারপর ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এসে খাব।

শশী গেছে মতিপুরের বাজার। মতিপুরের বাজার এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাজার, বিশেষ ক'রে ওষুধের এমন স্টক জেলার সদর-শহরেও নাই! 'প্রণ্টোসিল' আর কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শন আনতে গেছে শশী। ইন্‌জেক্‌শনের চেয়েও জরুরি দরকার প্রণ্টোসিল পিলের। পাওয়া না গেলে—সে কথা ভাবতে ডাক্তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠে। আন্নু ঠাকুরের ছেলেটির ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হয় নাই, হয়েছে মেনিন্‌জাইটিস। ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি, টাইফয়েড—এগুলোর আনুষঙ্গিক হিসেবে এতদিন ছিল শুধু নিউমোনিয়া এবার মেনিন্‌জাইটিসও এসে জুটল। কলেরাও চলছে এখানে ওখানে। কোন্‌টা কলেরা, কোন্‌টা ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া, কোন্‌টা বেরিবেরি সব সময়ে বুঝতে পারা যায় না। মানুষ মরছে।

আকাশের নৈঋত কোণে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে। ডাক্তার সেই দিকে তাকালে। লাল নীল সাদা তিনটে আলোকবিন্দু—উল্কার মত দ্রুতবেগে চলছে। প্লেন যাচ্ছে। দিন রাত্রি—কোন সময়েই বিশ্রাম নাই। আকাশে প্লেন চলছে, পথের উপর আজকাল দিনের বেলা যায় মিলিটারি লরি; গ্রামের পায়ে-চলা পথ ধরে চলছে মড়া-কাঁধে রোগা মানুষ। আট দিনে ডাক্তারের হাতের রোগীর মধ্যে সাঁইত্রিশটা রোগী মরেছে। আজ রাত্রেই বোধ হয় আরও চারটে যাবে! মিহির ডাক্তার বরাবরই ধীর চিকিৎসক: ধীরতার সঙ্গে সে চিকিৎসা করে, ভাল মন্দ দুইই সে গ্রহণও করে ধীরতার সঙ্গে! মৃত রোগীর হাতখানি ধীরে ধীরে তার বুকের উপর অথবা পাশে নামিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে উঠে আসে। বুঝতে পারলে, আগে থেকেই রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে বলেও দেয় সে

কথা। এবার তার শান্ত ধীরতা—এই হিমানীশীতল মৃত্যু-ঝড়ের স্পর্শে জলের মত জ'মে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চারটে হয়তো আজই যাবে, তা ছাড়া আজ হোক কাল হোক, দু দিন চার দিন পরে হোক, যাবেই, মৃত্যু নিশ্চিত, এমন রোগী—নসুরামের স্ত্রী; ব্যোমকেশ মুখুজ্জে, হরিধনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরনের ভাই পাঁচজন। পাঁচজন কেন, প্রণ্টোসিল আর ইন্‌জেক্‌শন-গুলো না পেলে—; শীতপ্রধান দেশের নদীর উপরের কঠিন বরফের স্তরের তলদেশের জল চঞ্চল হয়ে উঠল যেন, ডাক্তারের মন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সে অদ্ভুত মেয়েটির কথা। অচঞ্চল স্তব্ধ মেয়েটিকে সেই প্রথম দিন থেকেই একভাবেই দেখে আসছে। অবগুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে এক পাশে বসে থাকে, দেখা যায় শুধু দুখানি নিরাভরণতায় সকরুণ সুকোমল লাবণ্যভরা হাত, এই হাত দুখানি দেখলেই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন কাঙাল হয়ে গিয়েছে। আর দেখা যায় অতি শুভ্র দুখানি পা ; মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে তার মুখ, তাতেই সেই এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ ডাক্তার আজও বুঝতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের সন্দেহ হয়, মেয়েটি বোধ হয় পাগল অথবা—! ডাক্তারের মন অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরল, একটা সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র কিছু তার মনকে অতর্কিতে স্পর্শ করছে।

কান্নার রোল উঠছে। বেশি দূরে নয়। নসুরামের বাড়ি থেকে উঠছে। নসুর স্ত্রীই মারা গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার একটু হাসলে। আজই মরবে এমন কথা ডাক্তার ভাবে নাই। মরেছে, তাতেও বিস্মিত হয় নাই। হঠাৎ হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু!

কে?

আমি।

ডাক্তার টর্চটা জ্বাললে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডাক্তার উঠে এগিয়ে এল।—আপনি কি ওখান থেকে আসছেন?

হ্যাঁ। একবার চলুন আপনি।

ডাক্তারের পায়ের নখের ডগা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা উৎকন্ঠিত অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে খেলে গেল। গিয়ে কি করবে সে? কি করতে পারে? মিনিটখানেক সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ডাক্তারবাবু!

দৃঢ়সঙ্কল্পের একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তাই-ই করবে সে। লাম্বার পাংচারই করবে। তার বিদ্যার দুঃসাহসিক চেষ্টাই সে করবে। লাম্বার পাংচার পল্লীগ্রামে দুঃসাহসিক চেষ্টা। কলেজে সে দেখেছে, সেখানে বোধ হয় চার পাঁচটা কেস নিজে হাতে করেছে, কিন্তু তারপর আর করে নাই। তা-হোক। এ ছাড়া উপায় নাই।

সে সযত্নে পরীক্ষা ক'রে দেখে সূচ বেছে নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য আর আন্নুর মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিল ডাক্তারের কার্য্যকলাপ। থরথর ক'রে কাঁপছিল তারা।

মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে ডাক্তার সূচটা সযত্নে বার ক'রে নিয়ে নিশ্বাস ফেললে। এতক্ষণে তার অন্য দিকে তাকাবার অবকাশ হল। সামনেই লণ্ঠন জ্বলছে। উপরে মেয়েটি বসে আছে। তার মুখের অবগুণ্ঠন খসে গেছে! সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ডাক্তারের সূচটির দিকে। ডাক্তারের হাত থেকে সিরিঞ্জটা খসে পড়ে গেল। সে কেঁপে উঠেছে।

চকিত হয়ে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করলেন, ডাক্তারবাবু।

আন্নুর মা ঝুঁকে পড়ল রুগ্ন নাতির উপর, অনুভব ক'রে দেখছে সে।

ডাক্তার শান্তস্বরে বললে, রোগী ঘুমুচ্ছে।

ভট্টাচার্য্য বললেন, মায়ের চরণোদক একটু—

ডাক্তার বললে, দিন।

ও-পাশে বাইরের দরজার মুখে দীর্ঘাকৃতি কে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললে, কে, শশী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলে কেমন আছে?—কণ্ঠস্বরে তার অপরিসীম উদ্বেগ।

এখন একটু ভাল। কিন্তু তুই ওষুধ পেয়েছিস?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বার বার ঘাড় নেড়ে শশী বললে, আজ্ঞে না।

ডাক্তার সযত্নে ভাঙা সিরিঞ্জের কাচগুলি কুড়িয়ে নিয়ে উঠল। আন্নুর মাকে ডেকে বললে, দেখুন—

আন্নুর মা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য্য এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। শশীও এগিয়ে এল। ডাক্তার বললে, দেখুন, আমার—। বলেই সে ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

আন্নুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখে ব'লে উঠল, আপনি বলুন ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা—বোবা!

সকলের মুখে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি, বিস্ময়, করুণা, হয়তো কিছুখানি তাচ্ছিল্যও আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মুখে তার প্রকাশ সবচেয়ে কম; এ সন্দেহ তার হয়েছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললে, আমার শেষ চেষ্টা আমি করলাম। যদি ভাল থাকে, কাল সকালে খবর দেবেন।

ডাক্তার মাথা নত করে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হল আপনার বাড়ির দিকে।

ভট্টাচার্য্যও ডাক্তারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। উদাস দৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে পথ চলছিলেন ভট্টাচার্য্য।

শশী এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকে চেয়ে ; লণ্ঠনের আলোর ও-পাশে মেয়েটির দিকে চেয়ে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে কাঁপছে। আন্নুর মায়ের কথা কয়টির মধ্যে সে যেন গভীর আতঙ্কের কিছু সন্ধান পেয়েছে।

॥ ছয় ॥

বোবা মেয়ে কাঁদছিল। রাত্রি প্রায় তিনটে। ছেলেটি মারা গেছে। শশী আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল আন্নুর বাড়ি থেকে।

কালা বোবা বউটি, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আন্নুর মা নাতির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল। মধ্য-রাত্রি থেকে আবার তার আক্ষেপ শুরু হয়েছিল; চীৎকার ক'রে উঠছিল সে আগের মত। কালা বউটিব সেসব কিছুই কিন্তু কানে যায় নাই। ছেলেকে ঘুমুতে দেখে সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একে কালা, তার উপর ঘুমন্ত অবস্থা চীৎকার তাকে স্পর্শই করে নাই।

শশী কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই ছিল, যায় নাই। কেউ অনুরোধ করে নাই, তবু সে গভীর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে বসে ছিল। গলার ভিতব কিন্তু যেন মধ্যে মধ্যে আটকে যাচ্ছে, মনে হয়েছে, কাঁধের উপর থেকে আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত একটা মৃদু অথচ অত্যন্ত অস্বস্তিকর যন্ত্রণা অনুভব করছে; বুকের ভিতরে ঢেঁকির আঘাত পড়ছে এমনই ভাবে হৃদ্‌পিণ্ড লাফাচ্ছে, তবু সে যেতে পারে নাই। ভগবানকে ডাকে নাই। ডাক্তারের এই সূচ ফুটিয়ে চিকিৎসায় ফল হবে এমন আশা করে নাই, বসে ছিল কখন ছেলেটার হয়ে যাবে এই প্রতীক্ষা ক'রে। এক-একবার ছেলেটা নড়েছে, আর শশী চমকে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, তার টুঁটিটা কে চেপে ধরলে যেন। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে তার জল পড়েছে বহুবার।

আন্নুর মা ব্যস্ত হয়ে উঠল, ঝুঁকে পড়ল নাতির-উপর। শশী উপর হয়েই জানোয়ারের মত এগিয়ে গেল খানিকটা।

চীৎকার ক'রে কেঁদে আন্নুর মা শিশুটির বুকের উপর আছড়ে পড়ল। শশী কাঁপতে আরম্ভ করলে, মনে হল, তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। বউটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। মুখের ঘোমটা খসে গেছে। শশী অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, ওঃ—ওঃ—ওঃ! ওই চীৎকারে জাগল বউটি। তার বধির কানের নিদ্রাস্তব্ধ স্নায়ুতন্ত্রীতেও ঘা দিয়েছে শশীর চীৎকার। বউটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলে, শাশুড়ী শিশুর উপর উপুর হয়ে পড়েছে। কুৎসিত শশীর কান্নায়-ভাঙা বিকৃত মুখ তার চোখে পড়ল; কানেও যাচ্ছিল এই চীৎকারের স্পর্শ, অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে গুহামুখের শব্দ-ধ্বনির মত। সেও উপুর হয়ে পড়ল ছেলের উপর, হাত দিয়ে নেড়ে স্পর্শের মাধ্যমে বুঝলে, স্থির দৃষ্টিতে ছেলের নিস্পন্দ দেহের দিকে মুখের দিকে চেয়ে বুঝলে, তারপর—ছেলের দেহটা ছিনিয়ে নিলে একটা চীৎকার ক'রে। বোবার শোকার্ত্ত চীৎকার; তার মধ্যে কথা নাই, শুধু একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি, হ্যাঁ, একখানি কণ্ঠস্বর। কার্ত্তিক মাসের আকাশে উল্কাপাত হয় বেশি, শশীর মনে পড়ল সেই তারা খসে পড়ার কথা, হঠাৎ আকাশ চিরে ছুটে যায় নীল আলো, কিছুদূর গিয়ে নিবে যায়। চোখ সইতে পারে না, মন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে, কিন্তু এমন আলোর ছটা আর হয় না। ঠিক তেমনই। এমন কান্না আর হয় না। সে কখনও শোনে নাই।

শশীর আর সহ্য হল না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অমাবস্যার কাছাকাছি বোধ হয়। রাস্তার দু পাশে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিরেট মাটির ঢিবির মত। হঠাৎ চোখে পড়ল সরু লম্বা এক টুকরো আলো। জানালার মুখের ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বেরিয়ে আসছে। শশী দাঁড়াল। ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারেরই বাড়ি; শশীর ভুল হয় নাই। জানালা খুলে গেল।—কে? শশী? ডাক্তারেরও চিনিতে ভুল হয় নাই। অনেক

রোগীরই মরবার আশঙ্কা আছে, তাদেরও আপনার জনেরা আসতে পারে, কিন্তু ডাক্তার এই ডাকটিরই প্রতিক্ষা ক'রে বিনিদ্র বসে ছিল। আরও সে জানত, শশীই আসবে ডাকতে।

একবার আসুন।—মরে গেছে জেনেও শশী ডাকলে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। শশীকে প্রশ্ন করলে না কেমন অবস্থা!

শশী বললে আপনি যান, আমি ভটচায মশায়ের কাছ থেকে মায়ের পুষ্প নিয়ে আসি।

ডাক্তার বললে, যা, ছুটে যা।

শশী আবার ছুটল।

ভট্টাচার্য্য বাড়িতে নাই। মায়ের মন্দির থেকে ফেরেন নাই আজ! শশী আবার ছুটল। চারপাশে ঘন জঙ্গল, থমথম করছে চারিদিক, চিঁ-চিঁ ঝিঁ-ঝিঁ ক'রে ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর কত কীটপতঙ্গ, চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে ডাকছে প্যাঁচা। রাত্রি তিন পহর হয়ে গেল। শশী ঢুকল চণ্ডীতলায়। মন্দিরের অন্ধকার বারন্দায় ভট্টাচার্য্য বসে আছেন স্থির হয়ে। শশী ডাকলে, ভটচায মশায়! ঠাকুর মশায়!

তারা, তারা মা! ভট্টাচার্য্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কে? শশী?

আজ্ঞে মায়ের পুষ্প নিয়ে চলুন একবার।

ভট্টাচার্য্য উঠলেন, পুষ্প নিলেন। তার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। জীবনে বোধহয় এমন কষ্ট কখনও হয় নাই। তবু বলতে চাইলেন, ভয় কি? কোন ভয় নাই। কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা বের হল না। অন্ধকার ঘুমন্ত পল্লী মধ্য দিয়ে চারিখানি পায়ের শব্দ দ্রুততালে বেজে এগিয়ে চলল। আরও একটি ক'রে শব্দ দুজনেরই কানে আসছিল, বুকের ভিতরে ধকধক শব্দ উঠছে।

* * *

বোবা মেয়ে কাঁদছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। ভট্টাচার্য্য বেরিয়ে এলেন। শশীও

এল। আন্নুর মা ডাক্তারকে কিছু বললে না, ভট্টাচার্য্যকে ডাকলে না, ডাকলে, বাবা শশী!

তিনজনেই দাঁড়াল।

আন্নুর মা বললে, খোকার গতি কি হবে বাবা? তুমি—

ডাক্তার বললে, তুই যা শশী, তা ভিন্ন—

ভট্টাচার্য্যের গলা দিয়ে বের হল—অদ্ভুত একটা স্বর।

এদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুকে দাহ করে না, মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়।

আন্নুর মা বললে, নিয়ে আমি যাব। কিন্তু গর্ত্ত করতে আমি তো পারব না।

ভট্টাচার্য্য দাঁড়ালেন, এগিয়ে চললেন দ্রুতপদে। ঘাড় হেঁট করে যেতে যেতে হাতের মুঠোর মধ্যে তিনি কচলে পিষ্ট করছিলেন একটা জবাফুল, দু-তিনটা বেলপাতা।

ডাক্তার ডাকলে, দাঁড়ান ভট্টাচার্য্য মশায়। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

ভট্টাচার্য্য দাঁড়ালেন না। ডাক্তার গতি দ্রুততর করলে।

রাত্রিশেষে হিমতীক্ষ্ণ বাতাস বইতে সুরু করেছে। পাশেই একটা বাড়িতে কেউ বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কাঁদছে। ঘুম ভেঙে গেছে, সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়েছে মৃত প্রিয়জনকে। দূরে কোথায় কতগুলো কুকুর একসঙ্গে চীৎকার ক'রে কাঁদছে। হ্যাঁ, কাঁদছে। কুকুর কাঁদে। ডাক্তার আরও দ্রুত চলতে চেষ্টা করলেন। এগুলো তাকে তত পীড়িত করছে না, কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে ওই বোবা মেয়ের কান্না।

ভট্টাচার্য্য পিছন থেকে ডাকলে, দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। যুবক ডাক্তার, ভট্টাচার্য্যকে অতিক্রম ক'রে গেছে। ডাক্তার দাঁড়ালে না।

সে অস্থিরভাবে টেনেছিল স্টেথোস্কোপের রবারের নল দুটো একটা নল ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে। কি হবে ডাক্তারি করে?

বোবা মেয়ের কান্না এখনও শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর কান্না। ডাক্তারের মনে হল ও কান্না যেন কখনও থামবে না। চারিদিকে কান্না। মানুষ মরছে। মরবে। আর বোধ হয় তাদের নিষ্কৃতি নাই। এই তেরো শো পঞ্চাশেই সব ধুয়ে মুছে যাবে। চীৎকার করতে ইচ্ছে হল ডাক্তারের—ভুয়ো, ভুয়ো, সব ভুয়ো। সে ছুটে গিয়ে উঠল আপনার ডিস্‌পেন্সারির দাওয়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যেই সে চেয়ারে বসে পড়ল।

চমকে উঠল ডাক্তার। বোবা মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের কোণ চিরে আসছে সে কান্না।

কান্না নয়, ঝিঁঝিঁর ডাক।

ডাক্তার টর্চ জ্বাললে ; পোকাটা দেখা যায় না। আলোর ছটাও গিয়ে দেওয়ালে পড়ছে না, পড়ছে আলমারির উপর। পয়জ্‌ন! বিষ! সাবধান!

ডাক্তার অগ্রসর হল আলমারির দিকে।

ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য্য ডাকছেন রাস্তা থেকে। ডাক্তার উত্তর দিলে না। টর্চটা নিবিয়ে দিলে।

ভট্টাচার্য্য আবার ডাকলেন। কিন্তু উত্তর এল না। ভট্টাচার্য্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন চণ্ডীতলার পথে।

দরজা খুলে দেবীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ ভেবে, নেড়ে দেখলেন দেবীপ্রতিমা। শীতার্ত্ত শেষরাত্রিতে মূর্ত্তি থেকে হিম বের হচ্ছে। কঠিন। মানুষের শবও এত কঠিন হয় না।

ভট্টাচার্য্য যেন পাগল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ ইচ্ছে হল, বলির খাঁড়াখানা দিয়ে—। শিউরে উঠলেন

ভট্টাচার্য্য। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে খাঁড়াখানা আরও শক্ত ক'রে ধরলেন, নিজের গলাতেই—

আন্নুর মা বললে, শশী!

শশী নির্ব্বাক হয়ে বোবা মেয়ের কান্না শুনছিল, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল মেয়েটির শোকার্ত্ত অসম্বৃত রূপ। সে কোন উত্তর দিলে না।

আন্নুর মা বললে, চল বাবা।

শশী শুধু বললে, হুঁ।

আন্নুর মা অদ্ভুত, শশীর ওই 'হুঁ' শোনবামাত্র ঘর থেকে একখানা কোদাল বের ক'রে দিলে, এগিয়ে গিয়ে টেনে ছিনিয়ে নিলে মরা ছেলেটাকে মায়ের কোল থেকে। এবার যে চীৎকার করলে বোবা মেয়েটা, তাতে শশীর মনে হল, তার মাথার ভিতরে কে যেন একটা গরম লোহার সূচ ফুটিয়ে দিলে। সে যেন পাগল হয়ে গেল। মনে হল, নিজের কণ্ঠনালীটাই তার লোহার মত হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, তা হলে ওই চীৎকার আর তাকে শুনতে হবে না।

আন্নুর মা হনহন ক'রে চলেছে নাতির দেহটা নিয়ে। তার অনন্ত দুঃখ। তবু তার অনন্ত ভাবনা। বাঁচবে কি ক'রে? খাবে কি? বেচবে? বোবা বউটাকে বেচবে?

শশী পিছনে চলতে চলতে ভাবছিল। কি ভাবছিল ঠিক বুঝতে পারছিল না। একবার মনে হল, পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে এই কোদালখানা বসিয়ে দেয় আন্নুর মায়ের মাথায়।

আবার মনে হল, ফিরে গিয়ে ওই বোবা মেয়েটার গলায় এক কোপ মেরে ওকে চুপ করিয়ে দেয়।

আবার মনে হল, নিজের মাথায় মারে কোদালখানা।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল। সাপ! লাফ দিয়ে সরে গিয়ে সে

কোদালখানা তুললে, মারবে সাপটাকে এক কোপ। পর মূহূর্তে কি খেয়াল হল, আবার লাফ দিয়ে পড়ল সাপটার উপর। নে, দে কামড়ে দে।

মরা সাপ! না। দড়ি একগাছা।

আন্নুর মা হঠাৎ অনুভব করেছিল, শশী পিছনে নাই। সে ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকলে, শশী!

শশী দাঁতে দাঁত ঘসছিল।

পিছন থেকে এখনও ভেসে আসছে বোবা মেয়ের কান্না। শশীর ইচ্ছে হচ্ছে, দুনিয়াসুদ্ধ লোককে খুন করতে—ডাক্তারকে, ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যকে, আন্নুর মাকে, বোবা মেয়েকে।

শশী! ও বাবা!

হুঁ।

পরদিন সকালবেলা।

ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলে। উঃ, কি রাত্রিই গেছে কাল! এখনও বিষের আলমারির দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রোগী অনেকে এসে বসে আছে। অনেকে আসছে। প্রতিদিনের মত আজও গত রাত্রে কে কে মরেছে, তারই হিসেব হচ্ছে। তিনজন মরেছে গত রাত্রে। নস্থুরামের স্ত্রী, পঞ্চু বাউড়ী, গোবিন্দ বৈরাগী।

আন্নু ঠাকুরের ছেলেটিও মরেছে কাল।—একজন বললে।

ডাক্তার আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাত্রি জাগরণের অবসাদে অবসন্ন ডাক্তারের কানের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে এখনও যেন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে বোবা মেয়ের কান্না। সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে মনের উদাসীনতার সুযোগে ভেসে উঠছে সেই ছবি।

ডাক্তারবাবু!

ব্যোমকেশ বাবুর ভাইপো। কুড়িটি টাকা টেবিলের উপর দিয়ে সে বললে, ওষুধের দাম। আর—

ডাক্তার অবসন্ন দৃষ্টি তুলে চাইলে তার দিকে।

এ বেলা যাবেন বারোটার পর।

বারোটার পর ?

হ্যাঁ। আজ স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। হয়ে যাক স্বস্ত্যয়নটা।

ডাক্তার চুপ ক'রে বসে রইল।

ব্যোমকেশবাবুর ভাইপো মৃদুস্বরে বললে, চণ্ডীতলায় পূজো দিলাম, বলি দিলাম, খানিকটা প্রসাদী মাংস আছে। বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দিই ?

ব্যোমকেশের ভাইপো আবার বললে, কেমন গণ্ডগোল দেখুন না ; ভট্টাচার্য্য মশায় মানে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য মশায় আজ থেকে পূজো ছেড়ে দিলেন।

ছেড়ে দিলেন ?

হ্যাঁ। আজ থেকে ওঁর ছেলে পূজো করবে।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, চোখে জল এল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চোখ বুঝল! চোখের পাতার চাপে কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুটি জলধারা। ব্যোমকেশের ভাইপো অবাক হয়ে গেল।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার রুমাল বের করে চোখের জল মুছে ফেললে। তাবও ইচ্ছা হল, ওই ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্যের মত সেও তার কাজ ছেড়ে দেয়। তার ওষুটপত্র যন্ত্রপাতি সব ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। তার বই খাতা সব ছিঁড়ে আগুনে গুঁজে দেয়।

তার কানের পাশে এখনও বাজছে সেই বোবা মেয়ের কান্না। ওই কান্নার মধ্যে থেকে সে শুনতে পাচ্ছে পৃথিবী-মায়ের কান্না। তার চিকিৎসক-জীবনে অনেক মায়ের অনেক শিশুকে সে মরতে দেখেছে, তাদের কান্নাও সে শুনেছে, কিন্তু এমন কান্না সে কখনও

শোনে নাই, কোন কান্না এমন ভাবে পৃথিবীর বুক থেকে আকাশলোক পর্য্যন্ত পূর্ণ ক'রে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত কাল থেকে প্রবহমান শোক প্রবাহের অবিচ্ছন্ন ফল্গুধারার সন্ধান তাকে দেয় নাই। ডাক্তারি পড়বার সময় হাসপাতালে অনেক মৃত্যু সে দেখেছে, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মৃত্যু, বিচিত্র রোগে মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে চিকিৎসক হিসেবে। কিন্তু আজ মৃত্যুর একটা অদ্ভুত রূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডাক্তার?—ব্যোমকেশের ভাইপো ডাকলে।

ডাক্তার উত্তর দিলে না। তার চোয়ালের হাড় দুটা উঁচু হয়ে উঠল। ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে—ক্ষুব্ধ আক্রোশে।

এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। মৃত্যুকে মানুষ আপনার স্বার্থের জন্য ব্যবহার করছে। যেমন ভাবে চিতাবাঘ পুষে, মানুষ তাকে হরিণের পালের উপর লেলিয়ে দেয়, তেমনই ভাবে লেলিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধ সৃষ্টি করলে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করলে, দলে দলে মানুষ মরল; মহামারী এল, মহামারিতে দেশ শ্মশান হয়ে গেল। প্রতিকারের পথ রুদ্ধ। বিজ্ঞান পঙ্গু।

কি করবে? এ অবস্থায় সে কি করবে? ও কি! বোবা, মেয়ের কান্না, এমন উচ্চ হয়ে উঠল যে! ডাক্তার অস্থির হয়ে উঠল।

কান্না নয়, আকাশে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে।

ছেলেরা চীৎকার ক'রে উঠল, ওরে বাবা রে, কত রে! কত রে!

ব্যোমকেশের ভাইপোর স্তব্ধতা আর সহ্য হল না। সে উঠল, বললে, ও বেলাতেই দেখে ওষুধ দেবেন।

কান্না নয়, এরোপ্লেনের শব্দ। ডাক্তার আশ্বস্ত হল।

ব্যোমকেশের ভাইপো যাবার সময় বললে, টাকাটা দেখে নিন ডাক্তারবাবু। কুড়ি টাকা।

ডাক্তার সচেতন হল। সে টাকা কয়টা গুনে নিলেন। বাইরে

রোগী প্রায় কাতারে কাতারে বললেও চলে। ওদের দেখতে হবে। প্রেসক্রিপশন লিখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে।

এরোপ্লেনের ঝাঁক এগিয়ে আসছে! গর্জ্জন বাড়ছে। সে শব্দ ছাপিয়ে উঠল কান্নার শব্দ—তারস্বরে কাঁদছে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠের কান্না।

কে? কে রে? কে গেল? বাইরে রোগীরা গবেশণা করছে।

ডাক্তার লিখেই চলেছে। ও কান্না তাকে বিচলিত করে না। যে কান্না কাল রাত্রে শুনেছে তারপর।

কান্না এগিয়ে আসছে।

কে? কে? শশীর বউ? শশী ডোমের বউ? কি হল রে? অ-ডোম-বউ!

ওগো, আমার মরদ।

কে, শশী?

হ্যাঁ গো। গাঁয়ের বাইরে গাছের ডালে গলায় দড়ি লাগিয়েছে। থানায় খবর দিতে যেছি গো।

শশীর স্ত্রীও থেমে গেল, আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে। একদল—বিশ-পঁচিশখানা উড়ো জাহাজ চলেছে।

ডাক্তারের কলম থেমে গেছে।

শশী আত্মহত্যা করেছে? এরোপ্লেনের শব্দের মধ্যে বোবা মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে ডাক্তার।

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

অজয়ের তীরে একখানি গ্রামে একটি আখড়া। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। গাছগুলির বয়স দশ বারো বৎসরের বেশি নয়। গুটি-চারেক নারিকেল গাছ। তাল নারকেল গরুতে মুখ না দিলে, পরিচর্যা ভাল হলে বারো বছরেই ফল দেয়। গাছে নারকেল এখনও ফলে নি। তবে ফলবে শীঘ্র তাতে ভুল নেই। গাছগুলি সতেজ পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে।

আখড়াটির বয়সই বারো বছর। ঘর-দোরগুলি বারো বছরে খুব পুরানো নয়। তার উপর বারান্দায় কিছুদিন আগে টিন পড়েছে। বাঁধানো হয়েছে। তাতে নতুন বলে মনে হয়। অঙ্গনটি ঝকঝক তকতক করছে। পরিচ্ছন্ন নিকানো। ছোট একটি ধানের মরাই। ওদিকে একটি গোশালা। সামনে একটি ছোট পরিপাটি ঘর। ঘরখানি পূজা-মন্দির।

আখড়ার মালিক কুৎসিৎদর্শন গোবিন্দ দাসের বয়স পঞ্চাশ। সবল স্বাস্থ্যবান মানুষ, রূঢ় গঠন। আধপাকা দাড়ি-গোঁফ, আধপাকা লম্বা চুল, কপালে তিলক, নাকে রসকলি, মাথার লম্বা চুলগুলি রাখাল-চূড়া করে ব্রহ্মতালুতে ঝুঁটি করে বাঁধা। গোবিন্দ দাস দুপুরবেলা দাওয়ায় ব'সে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল আর আপন মনেই গুনগুনিয়ে গান করছিল—

মধুর মধুর বাঁশী বাজে কদমতলে কোথায় ললিতে—
কোন্ মহাজন পারে বলিতে?
(আমি) পথে মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে,
কোন্ মহাজন পারে বলিতে!

ও পোড়া মন, হায় পোড়া মন!
ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধুলা থেকে!
রাই যে আমার রাঙা পায়ে ছাপ দিয়েছে এঁকে—
মনের ভুলে গলিপথে ঢুকলি রে তুই বেঁকে!
পোড়া মন পথ হারালি—পা বাড়ালি
(চন্দ্রাবলীর) কুঞ্জগলিতে।

প্রবেশ করলে একজন ব্রাহ্মণ। বললে, কি গো বাবাজী, আজ ঘরে বসে।

ব্রাহ্মণ। (হেসে বললে) ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর, বাদ আজ থেকে বাবা।

ব্রাহ্মণ। কি রকম! হঠাৎ এমন মতি ফিরল?

গোবিন্দ। নাঃ, আর ভিক্ষেয় বেরুব না। এইবার ঠিক করেছি, ঘরেই সাধনভজন করব। মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করব, ওই নিয়েই থাকব।

ব্রাহ্মণ। বটে বটে! আজ শুনলাম কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়ায় দখল নিচ্ছে, আদালতের লোক এসেছে। তোমার তরফে কে গিয়েছে?

গোবিন্দ। আমার তরফে গিয়েছেন হরি ঘোষ।

ব্রাহ্মণ। হরি ঘোষ! হ্যাঁ, সে জাঁদরেল লোক বটে। তা—। তা আখড়া-সম্পত্তি-বিগ্রহ সবই নিলেম হয়ে গিয়েছে?

গোবিন্দ। হ্যাঁ। সব। কৃষ্ণদাসের বাপ আখড়া করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিল। দেবোত্তর কিছু করে নি। কৃষ্ণদাস পাঁচ শো টাকা ধার দিয়েছিলেন, সব বন্ধক দিয়ে। মহাজন গাঙুলী ভেবেছিলেন, বিগ্রহ বন্ধক রাখলে টাকাটা যে করে হোক পাবেন। তা কৃষ্ণদাস বাবুগিরি করেই গেল। বৈষ্ণবের আচারও মানে না, বাপ বিগ্রহ করে গিয়েছে, আছে ওই পর্যন্ত। সম্পত্তি পাঁচ বিঘে ডাঙা জমি। তাতে কুলোবে কেন? গোকুলে গোবিন্দের মত সুদে

আসলে হাজার টাকা হল যখন, তখন নালিশ করতে হল ; করলে কিস্তিবন্দি হল। সে কিস্তি খেলাপ যখন হল, তখন আমি খবর পেয়ে গিয়ে পূরো টাকা দিয়ে ডিগ্রি কিনে জারি করলাম। এইবার দখল।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

গোবিন্দ। দুঃখ হল না কি ঠাকুরের ?

ব্রাহ্মণ। দুঃখ ? না দুঃখ কিসের বল ?

গোবিন্দ। সে তুমিই বলতে পার। আমি কি করে বলব বল ?

ব্রাহ্মণ। তোমার আখড়াটি বেশ। অজয়ের একবারে ওপারে। লোকে বলে, অজয়ের জলের ছলছলানির মধ্যে জয়দেব প্রভুর পদ শোনা যায়।

গোবিন্দ। ও মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের কথা ময়ুরে বোঝে ; কদমতলায় বাজে বাঁশী—সবার মাঝে রাই উদাসী ! বলে লোকে শুনি ! যার কান আছে সে শুনতে পায়।

ব্রাহ্মণ। তুমি ? তুমি নিশ্চয় শুনতে পাও ?

গোবিন্দ। হরিবোল, হরিবোল ! ঠাকুর, কালাতে বাদ্যি শুনতে পায় একমাত্র ঢাকের, কানাতে ফুল দেখে সর্ষের, খোঁড়াতে নাচ দেখে ঢেঁকির। আমি বাবা কানা খোঁড়া কালার দলে। অজয়ের জলে আমি গ্রীষ্মকালে শুনি—কুল কুল, কুল কুল। কূল ভাঙ্ কূল ভাঙ্ ! জোড় হাত করে অজয়কে বলি—আমার ঘর বাদে বাবা, আমার ঘর বাদে। (একটু হেসে) আমাকে তোষামোদ করে ফল হবে না ঠাকুর। আমি জানি, তুমি কৃষ্ণদাস বাবাজীর চর। তুমি ওর সঙ্গে গাঁজা খেতে, একসঙ্গে যাত্রার দলে অ্যাকটো করে বেড়াতে। আমি জানি।

ব্রহ্মাণ। কঞ্জুষ বোরেগী কোথাকার, আমি চর ?

গোবিন্দ। কঞ্জুষ বললে রাগ করব না। বোরেগী ? হ্যাঁ, তাও আমি বটেই, কিন্তু তুমি বামুন—কেষ্ট বোষ্টমের চর। ওর মাথা তুমিই খেয়েছ।

ব্রাহ্মণ। খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবে। তোমার দফা আমি নিকেশ ক'রে দোব।

গোবিন্দ। তা দেবে। তবে আমি তার আগে হিসেব না ক'রে ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, (খপ ক'রে হাত ছেপে ধরলে) এই নদীর ধারে আখড়াতে আমি বারো বছর একা রাত্রি কাটিয়ে আসছি। বোষ্টম হ'লেও গান গেয়ে ভিক্ষের সময় ছাড়া হরিনামের সময় হয় না আমার। একা কোদাল চালিয়ে জমি করেছি, এই ঘর করেছি। আমার চালের বাতায় ওই দেখ হেঁসো আছে। বল তো ঠাকুর, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কোনকালে হাঁটো না, তুমি যাত্রার দলের রাণীমা সেজে বেড়াও, হঠাৎ আজ সংক্রান্তি-পুরুষের মত এখানে কেন? বল। নইলে হাতখানি ছাড়ব না।

ব্রাহ্মণ। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।

গোবিন্দ। না! বল আগে।

ব্রাহ্মণ। এইবার আমি চেঁচাব।

গোবিন্দ। তবু ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, মাথার আমার গোলমাল আছে। আমি পাগল হয়েছিলাম এক সময়। আমার ঘর ছিল, সংসার ছিল, ঘর-আলো-করা স্ত্রী ছিল, ভগবানে মতি ছিল। হঠাৎ পাগল হয়ে গেলাম। কাঁদতাম। শুধু কাঁদতাম। চার বছর কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছি পথে পথে। তার পরে ভাল হলাম। এখানে এসে আখড়া বাঁধলাম। শোন, আমার সেই মাথার গোলমাল এখনও মধ্যে মধ্যে ওঠে। এখানকার লোক জানে, আমি রাত্রে পাগলের মত ঘুরি উঠোনে। তুমিও জান। আমার সেই রোগ তুমি উঠিয়ো না। ঠাকু—র!

ব্রাহ্মণ ভয় পেলে এবার। গোবিন্দের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তার দেহ যেন ফুলছে। শরীর তার সত্যই যেন পাথরের। বলে উঠল, আমি বলছি। আমি বলছি।

গোবিন্দ। বল।

ব্রাহ্মণ। পাঠিয়েছে আমাকে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী।

গোবিন্দ। কৃষ্ণদাসেব স্ত্রী? কৃষ্ণদাস জানে না?

ব্রহ্মণ। তার জানা আর না-জানা! জান তো, সে এখন একটা ছোটজাতের মেয়ে নিয়েই উন্মত্ত। আহ্লাদী তার নাম।

গোবিন্দ। জানি। অহ্লাদীকে জানি না? রাত্রির অন্ধকারে সে সর্বনাশী মোহিনী! তাকে জানি না? কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তার প্রেমও জানি।

ব্রাহ্মণ। সেই। তার বাড়িতেই এক রকম থাকে সে। খায় শোয়—সব সেইখানে। আজকাল আবার গুলি খেতে শিখেছে।

গোবিন্দ। বলিহারি, বলিহারি! তার পর? কি বলেছে কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী? কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমীর তো এককালে রূপসী বলে খ্যাতি ছিল গো! এখনও তো তার রূপ আছে, বয়সও তো বেশি নয়। তিরিশ। আমি একদিন দেখেছি। একদিন গান গাইতে গিয়েছিলাম ও-আখড়ায়। বেশ রূপসী, তাতেও কেষ্টদাসের এই মতি?

ব্রাহ্মণ। তবু তার এই মতি। কি বলব বল বাবাজী! আমিও পাপের ভাগী। এককালে তখন আমাদের প্রথম যৌবন! কেষ্টদাসের বাপের কিছু পয়সা ছিল, কেষ্ট সেই পয়সায় নতুন ফুর্তি করতে লেগেছে। যাত্রার দলে ঢুকেছি। জয়দেবের মেলা গেলাম; সেখানে দেখা এক বামুনের মেয়ের সঙ্গে। নতুন বউ। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। গোবিন্দ মন্দিব থেকে বেরিয়ে এল, মনে হ'ল সাক্ষাৎ রাধা। কেষ্টদাসেরও তখন নতুন বয়স, তারও রূপ তখন লোকে দাঁড়িয়ে দেখে। যাত্রার দলে সে সাজত অভিমন্যু। অভিমন্যু বধ হত, লোকে ঝরঝর ক'রে কাঁদত তার ওঁই রূপের জন্যে।

গোবিন্দ। তারপর?

ব্রাহ্মণ। পরের দিন অজয়ের ঘাটে দেখা। মেয়েটি অবাক হয়ে চেয়ে রইল কেষ্টদাসের দিকে।

গোবিন্দ। তারপর?

ব্রাহ্মণ। তার পর আর কি? মেয়েটি গিয়েছিল বাপের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। স্বামী সঙ্গে ছিল না। পর পর তিন দিন কেষ্টর সঙ্গে দেখা হ'ল মেলায়। তিন দিনের দিন কাউকে কোনও কথা না বলে কেষ্ট হল উধাও। মেয়েটিকেও আর দেখলাম না দলে। গণ্ডগোল শুনলাম। কেউ বললে কিছু, কেউ বললে কিছু। আমি সব বুঝলাম। বাড়ি ফিরলাম, দেখলাম, কেষ্ট তাকে বউ সাজিয়ে বাড়ি এনে তুলেছে।

গোবিন্দ। তারপর?

ব্রাহ্মণ। তারপর আর কি বল?

গোবিন্দ। কি বলেছে কেষ্টদাসের বউ, তাই বল?

ব্রাহ্মণ। বলেছে, জোড়হাত করে বলেছে, জমি নাও, থালা-বাসন আর নাই কিছু তবে যা আছে তাই নাও, শুধু ঘরটুকু আর ওই বিগ্রহ ঠাকুর, এই দুটি ছেড়ে দাও।

গোবিন্দ। বটে!

ব্রাহ্মণ। বলেছে—বামুন ঠাকুরপো, তুমি বলো, ঘর নিলে আমি দাঁড়াব কোথায়! আর ঠাকুর নিলে আমি কি নিয়ে থাকব?

গোবিন্দ হুঁ। মেয়েটি রসিক বটে বামুনের ঘরে জন্ম, বৈষ্ণবের প্রেমে দীক্ষা, রসিকা হওয়ারই তো কথা। কিন্তু কি জান ঠাকুর, টাকার কারবারে রস নেই, ও হল শুক্‌নো কারবার। আমি গাঙ্‌লী মহাজনকে খরচা সমেত বারো শো টাকা গুনে দিয়েছি। আব এই টাকা বারো বছর ভিক্ষে করে একটি একটি পয়সা করে জমিয়েছি।

ব্রাহ্মণ। সে তা বলেছে।

গোবিন্দ। বলেছে? কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী তো শুধু রসিকাই নয়, সন্ধানীও বটে। অনেক সন্ধানী। কি বলেছে শুনি?

ব্রাহ্মণ। বলেছে, সবই জানে সে। জেনে শুনেই বলেছে, ভিক্ষে

চাইছে। দিলে তোমার ধর্ম হবে। প্রভুর রাজ্যে এখানে দয়া করলে সেখানে পায়, এখানে যা পেলে না সেখানে তা পাবে।

গোবিন্দ। ভাল, আমার উত্তর শোন। আমি বোষ্টম হয়েও সুদি কারবারী। ভক্তিপথের মহাজনি আমার নয়, দেনা-পাওনার মহাজনি আমার; আমার হল ডান হাতে নাও, বাঁ হাতে দাও। ফেল কড়ি মাখ তেল। বুঝেছ ঠাকুর। আমি যে দিন এখানে আসি সেই দিন থেকে ওই ঠাকুর আখড়া আর সম্পত্তির ওপর লোভ। ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমার বড় কষ্ট; এদের হাতের সেবায় আমার কষ্ট হয়, তুই আমাকে নিয়ে যা। পরদিন এইখানে বাঁধলাম আখড়া। তার পর রোদ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, প্রতিদিন গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে টাকা জমিয়েছি। চাল বেচে পয়সা, পয়সা গেঁথে রেজকি, রেজকি গেঁথে টাকা। লোককে সুদে টাকা ধার দিয়েছি; একটা পয়সা কাউকে ছাড়ি নি। সে কেবল ওই জন্যে। জমি করেছি, বৈষ্ণব হয়ে ধান পুঁতেছি, চাষে খেটেছি। আমি ছাড়তে পারব না।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই বলব আমি। (চলে যেতে যেতে ফিরল) ভামিনীকে আমি বলেছিলাম—ভাজবউ, আমাকে পাঠিয়ো না, আমাকে পাঠিয়ো না, সে চণ্ডাল, পিশাচ।

গোবিন্দ। হ্যাঁ, তা বলতে পার। মনের রাগ বলে কয়ে ঝেড়ে ফেললেই ভাল। বল, আরও দশটা কথা তুমি বল। চণ্ডাল—পিশাচ—দানব. চশমখোর, আর কি বলবে? দেখ, যাত্রার দলে রাণী সাজতে, অনেক কথা তুমি জান। বর্বর-টর্বর যা মুখে আসে বল।

ঠিক এই এসময়েই হরি ঘোষ এবং আরও জনকয়েক লোক এসে উপস্থিত হ'ল।

গোবিন্দ। এই যে ঘোষ মশায়! আসুন! কাজ সুশেষ হয়েছে?

হরি। হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে—

গোবিন্দ। 'তবে' বলে হ্যাঁক রাখছেন যে গো!

হরি। অন্য কিছু নয়, মেয়েটিকে—মানে, কৃষ্ণদাসের পরিবারকে বার করে দিলাম এই অপরাহ্ণ বেলায়। একটু কেমন লাগল দাসজী, ঘরে কুলুপ দিয়ে লাঠিয়াল জিম্বা করে রেখে এসেছি। বলে এসেছি, যদি দাসের মত হয় তবে রাত্রিটার মত একখানা ঘর খুলে দিবি।

গোবিন্দ। আজ্ঞে না। দখলে খুঁত হবে। ওতে আমি নেই। ও আমি অনেক জানি। এই নিন আপনার টাকা। ট্যাঁকে নিয়ে বসে আছি আমি।

হরি। টাকা নিচ্ছি। কিন্তু তা হলে তাই বলে দোব যে, হবে না।

গোবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ! অপরাহ্ণ কাল, সামনে রাত্রি, মেয়েটি সুন্দরী—সত্যি সবই ঘোষ মশায়। কিন্তু আমার টাকা আরও সত্যি। নিন এই আপনার পঞ্চাশ টাকা। আর এই পেনাম। জয়-জয়কার হোক আপনার। দরিদ্র বোষ্টমকে যে সাহায্য করলেন, চিরকাল স্মরণ থাকবে আমার।

বাহ্মণ। আবাব বলছি তুই চণ্ডাল—তুই—চণ্ডাল—তুই চণ্ডাল!

(সে দ্রুত পদে বের হয়ে গেল। প্রায় পাগলের মত।)

হরি। ও! ও সেই কেষ্টদাসের সঙ্গীটা বুঝি! কি নাম যেন?

গোবিন্দ! নটবর ড্যান্সিং মাস্টার গো। বেজায় দরদ! একেবারে গলায় গলায়! (হা-হা করে হেসে উঠল)

হরি। (সবিস্ময়ে বললে) তোমার হল কি দাস?

গোবিন্দ। কেন বলুন তো?

হরি। এমন করে হাসছ!

গোবিন্দ। (একটু লজ্জিত হ'ল, বললে) ওই একটা হাসি আমার আছে। বুঝেছেন না? জানেন তো সবই। একবার পাগল হয়েছিলাম তো! আর ওই ছিটটুকু আছে।

হরি। মাথায় একটু-আধটু ঠাণ্ডা তেল-মেখো। ভাল নয় এমন হাসি। বুঝলে!

হরি। আচ্ছা, আমি চললাম দাস। তুমি হাস। বুঝেছ। চাবি রইল এই। সেখানে লাঠিয়াল আছে। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার। না-ইচ্ছে হয় কাল সকালে গিয়ে যা·হয় ব্যবস্থা করো। আয় রে। সব আয়।

গোবিন্দ তখনও হাসছিল; সে হাসতেই লাগল; বাকি সকলে চলে গেল বাড়ি থেকে। গোবিন্দ অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অজয়ের জলের দিকে তাকিয়ে। অজয়ের ক্ষীণ স্রোতে তখন সন্ধ্যার লাল আলো ঝিকমিক করছে। বসে থাকতে থাকতে সে গান ধরলে—

সাধের কলস গলায় বেঁধে, ডুব দিয়ে আর উঠব না;
যমুনায় কদমতলায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।
মন-আগুনের জ্বালায় পুড়ে খাক্ হয়ে আর ছুটব না।
নিধুবনে, মধুবনে, তমালতলায় ছুটব না।
ও সাধের কলস গলায় বেঁধে—
ডুব দিয়ে আর উঠব না—

হঠাৎ আঙিনার নারিকেল গাছের আড়াল থেকে কেউ যেন বলে উঠল, হরি বলে আমাকে ভিক্ষে দাও গোঁসাই।

গান থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোবিন্দ দাস।

কে?

ভিক্ষে চাইতে এসেছি!

কি? (গোবিন্দ যেন এখনও ঠিক ধারণা করতে পারলে না)

কলসী—একটা কলসী!

গোবিন্দ এবার সপ্রতিভ হয়ে উঠল; বললে কেষ্ট দাসের বোস্টমী?

নারকেল গাছের আড়ালে ২৯।৩০ বছরের একটি সুশ্রী তরুণী

আধ-ঘোমটা টেনে সামনে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না—তবু বোঝা গেল।

গোবিন্দ। (আবার বললে) কৃষ্ণ-ভা-মিনী! গরবিনী!

ভামিনী। না আমি সতী।

গোবিন্দ। সতী? বল কি? সতী?

ভামিনী। হ্যাঁ, কলঙ্কিনী সতী। তুমি কুসুমপুরের গাইয়ে কালো গোস্বামী, তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী সতী।

গোবিন্দ। না না। তুমি কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণভামিনী। বড় ভাল নাম নিয়েছ। একেবারে প্রেমে ডগমগ! ত্রিলোক সংসারে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী সুখী। কিন্তু কি ভিক্ষে চাইতে এসেছ বললে? কলসী? না?

ভামিনী। হ্যাঁ, কলসী!

গোবিন্দ। আমার গান শুনেছ বুঝি? "যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।"

ভামিনী। শুনেছি। শুনেই চাইলাম। নইলে—

গোবিন্দ। নইলে, কি চাইতে! বল তো শুনি? কি চাইতে এসেছিলে? দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ভামিনী। আমি তোমার কাছে—

গোবিন্দ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। সবুর কর আগে—

ভামিনী। কি?

গোবিন্দ। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে কখন। আলো জ্বালা হয় নি। মনের ভুল দেখ দেখি!

ভামিনী। কি দরকার?

"চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে নীল মানিকের আলো জ্বলে;
রাধার কুঞ্জ আঁধার সেথা রাধা ভাসে নয়নজলে।"

—এ তো তোমারই গান। যেদিন এখানে এসে আমার সন্ধান পেয়ে আমাদের আখড়ায় গিয়েছিল, সেদিন এই

গানটাই শুনিয়ে এসেছিলে। রাধার কান্না দেখে কি করবে? আলো থাক্।

গোবিন্দ। তুমি কি আমাকে সেই দিনই দেখে চিনেছিলে? গোঁফ, দাড়ি, চুল—

ভামিনী। তবু চিনেছিলাম। তোমার কপালের ওই দাগ দেখে চিনেছিলাম।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। ফুলশয্যার রাত্রে তোমাকে টেনে বুকে নিতে গিয়েছিলাম—

ভামিনী। হ্যাঁ। আমি ধরা দিতে চাই নি, তুমি জোর করে টেনেছিলে, আমি, হাত ছুঁড়েছিলাম, আমার হাতের বালায় তোমার কপালে, ডান ভুরুর উপরে লম্বা হয়ে কেটে গিয়েছিল।

গোবিন্দ। আমি কালো, কুৎসিত, আমার বয়স বেশি বলে তুমি কেঁদেছিলে। তুমি রূপসী—

ভামিনী। হ্যাঁ, আমি রূপসী ছিলাম। রূপ আমার ছিল। আজও আছে। তুমি কুৎসিত, কালো, তোমার নাকের ডগার ওই আঁচিল। সেদিন চোদ্দ বছরের রূপসী মেয়ে সতী তোমাকে দেখে কেঁদেছিল, তোমাকে তার পছন্দ হয় নি। সেদিন ওই তোমার কপালের দাগ দেখেই তো শুধু চিনি নি, ওই আঁচিলটা দেখেও চিনেছিলাম।

গোবিন্দ। ওঃ! সাক্ষাৎ সতী ষোল বছরেও আমার মূর্তি তোমার হৃদয়পটে এতটুকু মলিন হয় নি!

ভামিনী। ছেলেবেলায় পট দেখিয়ে গান করতে আসত পটুয়ারা; তারা যমদূতের ছবি দেখাত, নরকের ছবি দেখাত, তাও হৃদয়পটে তেমনি আঁকা আছে গোঁসাই।

গোবিন্দ। দাঁড়াও দাঁড়াও। আলোটা জ্বালি, কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছি।

ভামিনী। আলো থাক্ গোঁসাই, আলো থাক্।

গোবিন্দ। লজ্জা! (হা-হা করে হেসে উঠল) সূর্য-চন্দ্র আকাশে আছে চিরকাল। যে দিন তোমার আমার বিয়ে হয়েছিল, সে দিন তাদের সাক্ষী মেনেছিলাম। তারা আজও আছে। এখানে অন্য কেউ তোমার পরিচয় না জানুক, তারা তো জানে। তাদের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় তোমার?

ভামিনী। না। লজ্জা আমার নাই। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। গোঁসাই, যাত্রার আসরে অভিমন্যুকে দেখে মনে হ'ল আমি জন্ম-জন্মান্তরের উত্তরা। পরদিন দেখা হল ঘাটে; কুল ভাবলাম না, জাত ভাবলাম না, ঝাঁপ দিলাম। লজ্জা ঘেন্না সব ভাসিয়ে দিলাম অজয়ের জলে। অজয়ের ঘাটে কোনদিন আমি চান করি না। ভয়ে করি না গোঁসাই। যদি আবার সেগুলো অজয় ফিরে দেয়! লজ্জা আমার নাই।

গোবিন্দ। তবে?

ভামিনী। তোমারও লজ্জা নাই, কিন্তু মনে তোমার যা আছে, সেই ঘায়ে আবার ঘা খাবে। বুকের ভেতরটা তোমার রক্তারক্তি হয়ে যাবে। আমি এখন আরও রূপসী হয়েছি গোঁসাই। সে দেখলে—

গোবিন্দ। দেখেছি। দেখেছি।

ভামিনী। সেও বারো বছর আগে। বারো বছরে রূপ আমার আরও বেড়েছে। বয়স আমার যত বাড়ছে গোঁসাই, রূপ আমার তত ফুটছে। আমাকে দেখে যদি আয়নাতে তোমার চোখ পড়ে গোঁসাই, তবে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

গোবিন্দ। তাই যাব! তবু তোমাকে দেখব।

ভামিনী। ভাল জ্বাল তবে আলো।

গোবিন্দ। (হাত ধরলে ভামিনীর) ঘরে এস।

ভামিনী। ঘরে? কিন্তু আর তো আমি ঘরণী নই।

গোবিন্দ কথার উত্তর দিলে না, জোর করেই যেন টানলে!

ভামিনী। জোর করে নিয়ে যাবে? চল। কিন্তু মানুষ পাখী নয় গোঁসাই, খাঁচায় পাখী পুষলে, পাখী শেখানো বুলি বলে, শিস দেয়। মানুষ দেয় না। মানুষকে বাঁধাও যায় না, কেনাও যায় না।

কথা বলতে বলতেই সে গোবিন্দ দাসের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেল। গোবিন্দ দাস আলো জ্বাললে। জ্বালতে জ্বালতেই বললে, তা জানি! তোমাকে আমি হাজার টাকা পণ দিয়ে কিনে বিয়ে করেছিলাম। এক দুই তিন করে গুনে—

বলতে বলতে সে আলোটা তুলে ধরলে। এবং আলোর ছটা ভামিনীর মুখের উপর পড়তেই সে হয়ে গেল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এমন রূপ এমন শ্রী এই ভ্রষ্টা দুঃখিনী মেয়েটির! স্তব্ধ হয়ে সে দেখতে লাগল।

ভামিনী। কি গোঁসাই কি হ'ল?

গোবিন্দ! (চোখ তার ঝকমক করে উঠল) আমাদের কুল ছিল না, কন্যাপণ দিতে হ'ত।

সে আলোটা নামালে।

ভামিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক দুই তিন চার পাঁচ করে বিয়ের আসরে তুমি আমার বাবাকে এক হাজার টাকা পণ দিয়েছিলে: সে আমার মনে আছে; বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল চোদ্দ বছর; শিশু ছিলাম না, মনে আছে সে কথা।

গোবিন্দ। (দরজার কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে বললে) সেই এক হাজার টাকার শোধ নেব।

ভামিনীর ঠোঁটে বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটে উঠল। সে উত্তর দিলেনা।

গোবিন্দের অন্তরের ক্ষোভ, সমস্ত সংযম ভেঙে যেন বেরিয়ে আসছে বলে মনে হ'ল, বলল, বাল্যাবধি আমি কুৎসিত—মনে মনে তার দুঃখ, কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের অন্ধকারের দুঃখের মতই গভীর ছিল আমার। দরিদ্র শুক্রবিক্রেতা ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান, বিয়ের সংকল্প

আমার ছিল না। এক সান্ত্বনা ছিল—সম্পদ ছিল—কণ্ঠস্বর, গুণী ওস্তাদ গলা শুনে ছেলে বয়সেই আমাকে কাছে টেনেছিলেন, গান শিখিয়ে-ছিলেন, তিনি বলেছিলেন—বাবা, ব্রহ্মচর্য যদি রাখতে পার তবে ভগবান মিলবে। বয়স হ'ল, নাম হ'ল, খ্যাতি হ'ল, পয়সার মুখ দেখলাম। বিয়ে করি নি, মেয়েদের মুখের দিকে চাইনি। পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর, তেত্রিশ বছর কাটল, চৌত্রিশ বছর বয়সে তোমাকে দেখলাম। শিবরাত্রিতে বক্রেশ্বরে মহাদেবকে গান শোনাতে গিয়েছিলাম। রাত্রে দেখলাম, চুল এলো করে লালপেড়ে শাড়ি পরনে, কপালে সিঁদুরের টিপ, কুমারী মেয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে, শিবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পূজো করছে। মনে হ'ল, সাক্ষাৎ গৌরী—উমা। পরদিন আবার দেখলাম দিনের আলোতে। আমি গুরুর উপদেশ ভুললাম, ভগবান পাওয়ার সংকল্প জলাঞ্জলি দিলাম, তোমাকে পাবার জন্যে পাগল হলাম। তোমার বাবার কাছে লোক পাঠালাম। পাঁচ শো, সাত শো, আট শো, হাজার—। একদিন যা বললে তোমার বাবা, পরের দিন বললে, না, ওতে হবে না, আরও চাই; তাই—তাই দোব। হাজার টাকা—তাই দিতে চাইলাম। শুধু তাই নয়। আমার পুরান, ভাঙা ঘর, নতুন করে সাজালাম। টিন দিলাম, মেঝে বাঁধালাম, দেওয়ালে কালি দিলাম, উঠানে তোমার পায়ে ধূলো-কাদা লাগবে বলে উঠান বাঁধালাম। তারপর তোমাকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম।

ভামিনী। গোঁসাই, এক কথা বিশবার শুনতে ভাল লাগে না। ওসব আমি জানি, তা ছাড়া ও-কথা আজ নিয়ে তোমার তিনবার বলা হ'ল। ফুলশয্যার রাত্রে—তুমি কুৎসিত, তুমি কালো, তোমার নাকে আঁচলি বলে আমি কেঁদেছিলাম। আমার রূপ দেখে তুমি ভগবান ভুলেছিলে; তোমার দেহে রূপ ছিল না বলে আমি যদি কেঁদে ভগবানকে ডেকে থাকি, বলে থাকি—আমার কপালে তুমি এই লিখেছিলে, তবে সেটা কি আমার খুব অপরাধ হয়েছিল?

গোবিন্দ। না, তোমার অপরাধ হয় নি; অপরাধ হয়েছিল আমার।

ভামিনী। হয়েছিল। হাজার বার। হয় নি? লোকে বলত আমি রাজরাণী হব, রাজপুত্র এসে আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। তার বদলে তুমি এলে। অপরাধ হয় নি?

গোবিন্দ। নিশ্চয়! কিন্তু তোমার বাবা টাকা নিয়ে—

ভামিনী। টাকা! টাকা! টাকা! বাবা টাকা নিয়েছিল, বাবার মুখে কালি লেপে দিয়ে চলে এসেছি। তুমি টাকা দিয়ে কিনেছিলে, তোমার বুকে আগুন জ্বেলে দিয়ে চলে এসেছি। গোঁসাই ফুলশয্যার রাত্রে কেঁদেছিলাম; কিন্তু পরে হয়তো বুঝতাম, অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম, তোমার এমন গান—ওই গান শুনেও তোমাকে ভালবাসতে পারতাম! কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে এই কথা যে কথাটা আজ নিয়ে তিনবার বলা হ'ল। বলেছিলে, হাজার টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ তুমি। আমার দাম হাজার টাকা গোঁসাই? আমি হাজার টাকায় বিক্রি হই?

গোবিন্দ। ভুল হয়েছিল। তোমার দাম একটা কানাকড়ি।

ভামিনী। না। রূপ। যা দেখে তুমি ভগবানকে কানাকড়ির মত ফেলে দিয়েছ, যার জন্যে চার বছর পাগল হয়ে ঘুরেছ, যার সন্ধান পেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত দিয়ে বোষ্টম হয়ে আখড়া বেঁধে একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে—কেষ্টদাসের আখড়া কিনেছ, বিগ্রহ কিনেছ, সেই রূপ। আমার দাম নাই। টাকায় হয় না। তাই ওই রূপের পায়ে আমার রূপ বিলয়ে দিয়েছি। আমি পেয়েছি। তুমি পাও নি। পেলে না।

গোবিন্দ। বলছ কি? পেলাম না? না? (উচ্চহাসি হেসে উঠল)

ভামিনী। হাসছ গোঁসাই! হাস। হাসি তোমার মিথ্যে।

গোবিন্দ। মিথ্যে? (হাসি তার থেমে গেল) না, মিথ্যে নয়। এবার পেয়েছি। আজ পাব।

ভামিনী। ভাল, কি দেবে আমাকে ?

গোবিন্দ। কি দেব ? এত দিয়েছি—

ভামিনী। কি দিয়েছ ? বল ?

গোবিন্দ। আবার তুমিই সেই টাকার কথা তুলছ। আমি টাকা ছাড়া কিছু বুঝি না। আমি দিয়েছি টাকা, এক হাজার টাকা—

ভামিনী। সে দিয়েছ আমার বাবাকে। বারো শো চোদ্দ শো টাকা খরচ করেছ—বিগ্রহ আখড়া উপলক্ষ্য; সে আমি জানি। লক্ষ্য আমি। কিন্তু সে টাকাও পেয়েছে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। আমি কি পেয়েছি ? কি দেবে আমাকে বল ?

গোবিন্দ। সব—সব। আমার যা আছে সব।

ভামিনী। না। ও চাইতে আমি আসি নি। আমি যা চাইব তাই দেবে বল ?

গোবিন্দ। বল, কি নেবে ?

ভামিনী! চাইতে এসেছিলাম বিগ্রহ। এসে আখড়ার পিছন দিক দিয়ে আখড়ায় ঢুকছি, শুনলাম তুমি গাইছ "সাধের কলস গলায় বেঁধে যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না"। শুনে তোমাকে এসে চেয়েছি কলসী। দুটোর যা হয় দিয়ো। বিগ্রহ যদি পাই তবে তোমার সঙ্গে বাসর সেরে তাঁর পায়ে বিলিয়ে দেব নিজেকে। না হ'লে ওই কলসীটা নিয়ে নামব গিয়ে অজয়ের কলঙ্কিনীর দহে।

গোবিন্দ। শোন সতী। আমি তোমার জন্য তপস্যা করেছি।

ভামিনী খিল খিল করে হেসে উঠল।

গোবিন্দ! হেসো না সতী, হেসো না। শোন।

ভামিনী। ভাল, আর হাসব না, বল।

গোবিন্দ। আজ আমিও বৈষ্ণব, তুমিও বৈষ্ণব। গৃহস্থ নই, আখড়াধারী। আমাদের প্রথা যখন আছে, তখন তুমি ফিরে এস। কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে আমার ঘরে এস। এ ঘর—এ আয়োজন সব তোমার জন্যে। সতী!

ভামিনী। না।

গোবিন্দ। সতী!

ভামিনী। না। না—না। তা ছাড়া আমি আর সতী নই, আমি ভামিনী—কৃষ্ণভামিনী।

গোবিন্দ। তবে তুমি বিগ্রহ পাবে না ভামিনী। কলসীই তোমাকে নিতে হবে।

ভামিনী। তাই দিয়ো। তা হ'লে বাসর পাত। আলোটা—

আলোটার শিখা এতক্ষণ বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না, এবার উজ্জ্বল ক'রে দিলে ভামিনী। গায়ে একখানি চাদর জড়ানো ছিল। চাদরখানি খুলে ফেললে সে। গোবিন্দের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে। বললে শপথ ভাঙতে পাবে না। কলসী আমাকে দিতে হবে।

গোবিন্দ ভামিনীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণ অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যে উত্তেজনাবশে মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলেছে। এবার উজ্জ্বল আলোয় তার দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখে চমকে উঠল। চাপা গলায় বলে উঠল, ভামিনী!

ভামিনী। কি? কি হ'ল?

গোবিন্দ। তুমি মা হবে? তোমার কোলে—

ভামিনী। হ্যাঁ। আমার কোলে চাঁদ আসবে।

গোবিন্দ। ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস। এতকাল পরে পথের ভিক্ষুক হয়ে—

ভামিনী। না—না—না। সে দুর্ভাগা তুমি। কালো গোঁসাই, তুমি।

গোবিন্দ। ভামিনী! বাহবা!

ভামিনী। বাহবা নয় গোঁসাই, বাহবা নয়। সাক্ষী আছে আহ্লাদী।

গোবিন্দ। (চমকে উঠল) আহ্লাদী?

ভামিনী। হ্যাঁ। গোঁসাই, আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি

কিন্তু ঠকাই নি। বিয়ের প্রথম দিন থেকে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ঠকিয়েছ নিজে নিজেকে। গোঁসাই, টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ ভেবে তুমি নিজেকে নিজে ঠকিয়েছিলে। গোঁসাই, তার পর এখানে এসে জাত দিয়ে টাকা জমিয়ে ভেবেছিলে, আমার তপস্যা করছ। অন্তত তাই তুমি বললে। সত্যি হ'লে নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ। তুমি আক্রোশ মেটাবার জন্যে তপস্যা করছিলে! আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে সুখ পাবে। সম্ভব হ'লে এই ভাবে আমাকে ধুলোয় ফেলে লাথি মেরে সুখ পাবে! গোঁসাই, তুমি আহ্লাদীর নেশায় পড়েছিলে, মনে পড়ছে? বেশি দিন আগে তো নয়, এই মাস সাতেক আগে। বল। লজ্জা তো তোমার নাই। আর আমার কাছেই বা লজ্জা কি তোমার!

গোবিন্দ। হ্যাঁ। কেনই বা লজ্জা করব? হ্যাঁ! আহ্লাদীকে আমার ভাল লেগেছিল। আমি তাকে—

ভামিনী। তুমি তাকে বলেছিলে, প্রতি বাসরে দশ টাকা করে দেবে।

গোবিন্দ। বলেছিলাম।

ভামিনী। কিন্তু আহ্লাদী যে আহ্লাদী, সেও তোমার এই কুৎসিত রূপ দেখে বলেছিল—না।

গোবিন্দ। মিছে কথা। টাকায় সব হয়। সে এসেছিল পাঁচ রাত্রি।

ভামিনী। হ্যাঁ, পাঁচ রাত্রি। আহ্লাদীর শয্যায় অন্ধকার ঘরে আলো না-জ্বালার করারে তুমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলে। আহ্লাদী তোমাকে বলেছিল, আলো জ্বাললে তোমার মুখ আমার চোখে পড়বে, আমি ঘেন্নায় মরে যাব। বল তুমি, এই শর্ত হয়েছিল কি না?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, হয়েছিল।

ভামিনী। আহ্লাদী আমাকে একদিন বললে। কৃষ্ণদাসের তখন কঠিন অসুখ। আহ্লাদী তাকে দেখতে আসত। সেও তার রূপে মজেছিল। বললে, ওই নরকের প্রেতের মতন চেহারা, ওর কথা শোন দেখি দিদি? সে এই বলে। মরণ আমার! জলে ডুবে মরব আমি, তবু না। এই দিন এলে ওকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। তখন আমার ঘরে কঠিন অবস্থা। মানুষটা হাঁপানিতে যায় যায়। ওদিকে বিগ্রহের সেবা হয় না। কৃষ্ণদাস আমাকে বললে, তুই যা। ওকে যদি হাতে করতে পারিস, সব রক্ষে হবে। কৃষ্ণদাসের অরুচি নাই, ঘেন্না নাই, সে সব পারে। আমার ওপর তার নেশাও ছুটেছে। নেশা তার আহ্লাদীর ওপর। রাজী প্রথমটা হতে পারি নি। একদিন বিগ্রহের সেবা হ'ল খুদ রান্না ক'রে। প্রসাদ ক'টি কৃষ্ণদাস খেলে; আমি উপোস করে রইলাম। সন্ধ্যেবেলা বিগ্রহের পায়ে মাথা কুটে কাঁদলাম। তারপর মন বাঁধলাম। আহ্লাদীকে বললাম, লোকটাকে তুই 'হ্যাঁ' বল্। তোর বদলে ঘরে থাকব আমি। তোর তো নামের ভয় নাই! দেখ্ তা হ'লে লোকটা বাঁচে। আমিই শর্ত বলে দিলাম। তুমি রাজী হ'লে। আহ্লাদী রইল কেষ্টদাসের শিয়রে, আমি ব'সে রইলাম আহ্লাদীর ঘরে, তারই শয্যায়। তুমি এলে। আংটিটা চিনতে পার? কার বন্ধকী আংটি তুমি দিয়েছিলে সোহাগ করে? এই দেখ।

ভামিনী হাত বাড়িয়ে ধরলে।

গোবিন্দ। (সভয়ে পিছিয়ে গেল) স-তী!

ভামিনী। হ্যাঁ, আমি সতী। তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম কিন্তু তবু তোমার পাপের ফল আমার গর্ভে! এর পর হয় ওই বিগ্রহ, নয়, কলসী ছাড়া আমার আশ্রয় আর কি বলতে পার? তবে বিশ্বাস কর, ওই বিগ্রহকে স্মরণ করেই প্রতি রাত্রির অভিসারে যাত্রা করেছি প্রণাম করে গিয়েছি। কৃষ্ণদাসের সন্তান ষোল বৎসরে হয় নি। এ আমার পঞ্চতপার ফল। এ তোমার সন্তান। প্রভুর দান।

গোবিন্দ। আমাকে তুমি মার্জনা কর সতী, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ভামিনী। মার্জনা! (হাসলে) আমার কাছে নয়। যার কাছে অপরাধ তার কাছে চাও। কিন্তু আমি আর পারছি না গোঁসাই। আমি আর পারছি না!

সে হঠাৎ ঝড়ে-ভাঙা গাছের মত ঘরের শয্যার উপর যেন ভেঙেই পড়ল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোবিন্দ তার মাথার কাছে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

গোবিন্দ। তুমি আজ সারা দিন কিছু খাও নি, না?

ভামিনী। উত্তর দিল না।

গোবিন্দ। খাওয়া হবে কি ক'রে? আজ আহারের পূর্বেই আমার লোকেরা গিয়ে ঘর দখল করেছে। কিছু খাও সতী।

ভামিনী মাথা নাড়লে, না—না।

গোবিন্দ। না, আমার হাতে তোমাকে খেতে হবে না। একদিন উপবাসে মানুষ মরে না। তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও।

গোবিন্দ মাথায় হাত বুলোতে লাগল, ভামিনী ধীরে ধীরে শান্ত নিথর হয়ে এল।

গোবিন্দ। সতী! (উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলে) সতী!

নিথর-দেহ ভামিনীর গাঢ় নিশ্বাস ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। গোবিন্দ উঠল। একবার একখানা আয়না টেনে মুখ দেখলে। দেখতে দেখতে গুন গুন করে গান ধরলে—

(হঠাৎ) গোলকধাঁধার বাইরে এলাম এলাম কোন্ পারে!
এ-পার ও-পার নাই পারাপার গভীর অন্ধকারে
ও বৃন্দে সখী, বলে দে দিশে
কৃষ্ণ আমার কালী হ'ল (আমি) পূজিব কিসে?
চন্দন সিন্দুর হ'ল শ্মশান-বসার ধারে
এলাম কোন্ পারে!

তার পর গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল

এদিকে ধীরে ধীরে সকাল হয়ে এল। পাখীর ডাকে চকিত হয়ে জেগে উঠে বসল ভামিনী। চাদরখানা গায়ে টেনে নিলে।

ভামিনী। গোঁসাই! গোঁসাই! গোঁসাই! (সন্তর্পণে বেরিয়ে এল, অভিসারিকার মতই মৃদুস্বরে বললে) আমি চললাম গোঁসাই।

খানিকটা এগিয়ে এসেই সে থমকে দাঁড়াল। খানিকটা দূরে একটি জনতা এগিয়ে আসছে। অজয়ের ঘাট থেকে। সামনেই হরিচরণ ঘোষ। ভামিনী পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

হরি। তুমি এই সকালেই এসেছ? গোবিন্দদাস তোমাকেই এই সব দিয়ে গিয়েছে। বিগ্রহের সেবায়েত করে গিয়েছে। তোমার পর তোমার ছেলে হবে সেবায়েত। পাগল, কাল তখন অনেক রাত্রি, আমাকে ডেকে তুলে এই সব ব্যবস্থা ক'রে—

ভামিনী। (রাঙা হয়ে উঠল) কিন্তু কোথায় গেল সে? সে কই গিয়েছে? বলছেন, কোথায় গেল?

হরি। আমাকে বললে, বৃন্দাবনে যাবে। বললে, এ ভোলে আর নয় ঘোষ মশায়, ভোল পাল্টে ফিরব। তার পর সকালে দেখি, কলঙ্কিনীর দহে তার দেহটা ভাসছে। ওই নিয়ে আসছে।
